হা রে ম

হারেম

শ্রীপান্থ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : শ্রীসুধীর মৈত্র

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৮

মূল্য : ৫·০০

মাতুল

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত

করকমলেষু

হা রে ম

ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল বাঁদী। ধবধবে শয্যায় একটা দলিত ফুলের মত পড়ে আছেন সুলতানা। বেশবাস বিস্রস্ত, চুল এলোমেলো, অঙ্গ শিথিল, কাজলের ছায়ায় বিস্ফারিত স্থির দুটি চোখ। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল বাঁদী। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ক'জন মানুষ ঘিরে দাঁড়াল ওকে। দ্বিতীয় আর্তনাদ গলা থেকে বের হওয়ার আগেই একজন চেপে ধরল মুখটা। তারপর ব্যস্ত কয়েকটি মুহূর্ত। ইশারা, ফিসফিস। দরবারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা—সুলতানা মৃত।

হারেম।

এমন দৃশ্য এই প্রাসাদে কেউ কখনও দেখেনি। স্বপ্নেও না। নিজের হাতে সাজানো বাগানটি আপন হাতেই তছনছ করছেন সুলতান সুলেমান। পরীর মত মেয়েগুলোকে তিনি দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। যে হাত বাড়াচ্ছে সে-ই ঘরে ফিরছে টকটকে লাল গোলাপ হাতে। কাঁটা নেই, কেবলই গোলাপ। সুলতানের এই বদান্যতার হেতু কী কেউ জানে না! প্রজারা ভাবিত। ভাবিত রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও।—কী হল সুলতানের? সে উত্তর তখনও জানে মাত্র একজন। পুরানো প্রাসাদের একটি কক্ষে বসে হাতের আর্শিতে মুখ দেখছিল মেয়েটি। রাঙা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।—তাহলে কথা রেখেছে সুলেমান!

হারেম।

কারাকক্ষের দুয়ারে হঠাৎ তুমুল হট্টগোল। হাতের কোরাণ-শরিফ বন্ধ করে সামনের বিশাল দরজাটির দিকে তাকালেন দ্বিতীয় সুলেমান। কারাগার, অতএব দুয়ার বাইরে থেকে বন্ধ। তাকালে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কারা যেন বাইরে

চীৎকার করছে। দরজায়ও করাঘাত পড়ল যেন। ইব্রাহিম শঙ্কিত। তাঁর বিবর্ণ মুখখানা আরও বর্ণহীন।—তবে বুঝি জীবনের শেষ প্রহরটি এল। বছরের পর বছর ধরে এরই প্রতীক্ষায় ছিলেন বন্দী ইব্রাহিম। তবু আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি,—এই কি ছিল নিয়তি? নিজের সমস্ত শক্তিকে এক করে কোন মতে উঠে দাঁড়ালেন ইব্রাহিম। দুয়ারে প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ। শিকারকে সামনে পেয়ে উল্লাসে চীৎকার করছে যেন একদল নেকড়ে। ইব্রাহিম ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন তিনি,—পালাবেন? কারাগারের অন্দরে ছুটে যাবেন? তার আগেই সশব্দে ভেঙে পড়ল সামনের দরজাটি। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খেলনার মত একটি মৃতদেহ ছুঁড়ে দিল ওরা তাঁর পায়ে।—জল্লাদ আর বেঁচে নেই। সগৌরবে ঘোষণা করল উল্লসিত জনতা। দেহটির দিকে তাকালেন ইব্রাহিম।—মুরাদ!—মুরাদ নয়, জল্লাদ। তাঁর স্বগতোক্তিটিও যেন শুনে ফেলেছে জনতা।—মুরাদই না আপনাকে নিক্ষেপ করেছিলেন কারাগারে! আমতা-আমতা করে কী যেন বলতে চাইলেন ইব্রাহিম। তার আগেই ধ্বনি তুলল ওরা—আপনিই আমাদের সুলতান!

হারেম।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু এই কক্ষটিতে দিনের রোশনাই। ঘরের চারদিকে আয়না। মাথার ওপরে ঝুলছে সার সার ঝাড়। মেঝেয় বাহারি গালিচা। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন অটোমান সাম্রাজ্যের বর্ষীয়ান সুলতান। তাঁর সোনার অঙ্গে কোথাও একফালি বস্ত্র নেই। উগ্র আতরগন্ধে কক্ষ ভরপূর। তারই মধ্যে উন্মাদের মত একাকী পায়চারি করছেন সুলতান। থেকে থেকে থমকে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজেকে দেখছেন। হঠাৎ দুয়ারে নূপুর-নিক্বণ। ভারি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল একদল মেয়ে। তারাও সম্পূর্ণ বিবসনা। লুব্ধ সুলতান ক্ষুধার্ত চোখে তাকালেন তাদের দিকে।

তারপর সুলতানী ভঙ্গীতে ঘোষণা করলেন—আজ তোমরা সবাই বনের হরিণী, আমি হরিণ!

হারেম।

সম্রাট বললেন—জ্যান্ত পুঁতে ফেল ওকে। হ্যাঁ, আজই, এক্ষুনি। দুর্গ থেকে জিঞ্জির বাঁধা বন্দিনীকে বের করে আনা হল বাইরে, ঘুমন্ত রাত্রির অঙ্গনে। ইট এল, পাথর এল। মশালের আলোয় ওরা রাত ভর কাজ করল। চোখের জলে চুন আর বালি মেশাল, বুকের আর্তনাদকে মুখে গান করে ফোটাল। দেখতে দেখতে ডালিম কুঁড়ির মত সপ্তদশী একটি তরুণীর দেহ ঘিরে গড়ে উঠল আট দেওয়ালের অনুচ্চ সৌধ। নিষ্ঠুর, নিশ্ছিদ্র। ভোরের আগেই মাথার উপরে শেষ তারাটি ঝাপসা হয়ে এল, শেষ ইট হাতে উঠল। ভেতরে যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে পাখি। আলোর বৃত্তে শেষ পাক অসম্পূর্ণ রেখেই বোধহয় মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়েছে পতঙ্গ। ওরা কান পাতল। কোন সাড়া নেই। ওরা আল্লার নাম নিল। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল হাতের শেষ পাথরটি। রাত্রি তখনও শেষ হয়নি।

হারেম।

টলতে টলতে গলিটার মুখে এসে ঠেকলেন ক্লান্ত, অবসন্ন আবু বকর। দুয়ার বন্ধ। নিশুতি রাত। চারদিকে কেউ কোথাও নেই। বাদশাজাদার গাড়ি নিয়ে ছুটে এল কোচম্যান্।—হুজুর! দরজা তো বন্ধ।—আবার সেই ষড়যন্ত্র! গর্জন করে উঠলেন মীর্জা আবু বকর। ষড়যন্ত্র করেই ফিরিঙ্গীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য হিন্দনে পাঠিয়েছিল ওরা আমাকে। এবার মতলব সারা রাত ফৈজবাজারে আটকে রাখবে।—তা আমি হতে দিচ্ছি না! কিছুতেই না! আবার গর্জন করে উঠলেন আবু বকর।—কোথায় গেল পাহারাওয়ালা, খুঁজে বের কর ওকে। দেখা গেল, একজন মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আবু বকর।—হুজুর,—সেলাম করে সামনে দাঁড়াল

লোকটি,—হুজুর, আমি পাহারাওয়ালা নই।—তবে কে তুমি?—আজ্ঞে, হুজুর নিশ্চয় মুফতি ইক্রামউদ্দীনের নাম শুনেছেন, আমি তাঁরই পুত্র আসান-উল-হক,—এই গলিতেই আমার বাস। উলেমার ছেলের কাছ থেকে কি শেষ রাত্তিরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আইনের পাঠ নিতে হবে আমাকে! রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন আবু বকর,—আমি জানতে চাঃ দরজা বন্ধ করে কোথায় গেল পাহারাওয়ালা? আসান-উল-হক উত্তর দেবার আগেই কোমর থেকে পিস্তলটি হাতে তুলে নিলেন শাহজাদা। পরক্ষণেই রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে এলোমেলো গুলির আওয়াজ।

ফৈজবাজারের এক অখ্যাত গলিতে যখন এই নাটক অভিনীত হচ্ছে, গলির মাথার ওপরে একটি জানালা থেকে তখন সকৌতুকে বাদশাহ-তনয়ের দিকে তাকিয়ে আছে একটি রমণী। উপভোগ্য দৃশ্য বটে! ভাবতেও হাসি পায়। তবু বেদনার সঙ্গেই যেন ফারকান্দা জামানি বেগমের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি শব্দ—বেচারা! প্রাসাদে যার রাশি রাশি হুরী, সে-ও কিনা একজন সামান্য নারীর আকর্ষণ এড়াতে পারছে না!

হারেম।

এই অন্দর আমার সাম্রাজ্য। আমার উচ্চাশা, আকাঙ্ক্ষা সব একে ঘিরেই। আমি জানি, সম্পূর্ণ অর্থে আমি পুরুষ নই। কিন্তু সেজন্য কোন খেদ নেই আমার। আমাকে ঘিরে এই যে রূপসীর দল, এদের ঘৃণাকে আমি পেয়ালা ভরে পান করি। কেননা, একমাত্র ওদের দিকে তাকিয়েই আমি জানতে পারি, আমি কে, কী আমার অস্তিত্ব। ওরা বিনা কারণে আমাকে ঘৃণা করে না। কিছুই যে আমি দিতে পারি না ওদের! যা পারি ইচ্ছে করেই তা-ও দিই না। ইচ্ছে করেই ওদের পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াই আমি, কোন ষড়যন্ত্রই ওরা আমার জন্য সফল করতে পারে না। ওদের সব প্রশ্ন, সব চাহিদার জবাবে আমার এক-ই উত্তর—না।

কর্তব্য, ধর্ম, সতীত্ব, নম্রতা—ইত্যাদি ছাড়া আমার মুখে আজ আর অন্য কোন কথা নেই। কিন্তু বরাবরই কি এমন ছিলাম আমি ?··· মেঝেয় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আত্মানুসন্ধান করছে বৃদ্ধ খোজা। চোখ বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছে কানের পাশ দিয়ে, যেন—বসফরাস।

হারেম।

—ও তাইতো! সত্যিই তো অলক্ষুণে ওরা! না, এ বেগম আমি চাই না।—মূল্য আছে আমার জীবনের। আমি পথের মানুষ নই। লক্ষ লক্ষ প্রজার ভাগ্য জড়িয়ে আছে আমার ভাগ্যের সঙ্গে।—না, চাইনে, চাইনে!—সর্বনাশীদের নিয়ে সুখে কাল-কাটাবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই আমার।—যাও, তোমাদের ছুটি দিলাম আমি।—তোমরা আমাকে ছেড়ে যেতে বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ করছ না? উত্তরে আবার খিল খিল করে হেসে উঠল ওরা। অপলক দৃষ্টিতে ওয়াজিদ আলি তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। সত্যিই চলে যাচ্ছে মেয়েগুলো।

ইতি ভূমিকা।

তুর্কী সুলতানেরা তাঁদের অন্দরের নাম দিয়েছিলেন হারেম। শব্দটা জাতে তুর্কী নয়, আরবী। অর্থ—নিষিদ্ধ। মক্কা আর মদিনার চারপাশ ঘিরে অনেকখানি এলাকা 'হারাম,' অর্থাৎ নিষিদ্ধ এলাকা। সমগ্র অঞ্চলটি দেওয়াল ঘেরা নয়, কিন্তু সবাই জানে অন্যত্র যা চলে এখানে তা অচল। এ এলাকার রীতিনীতি একটু অন্যরকম, স্বতন্ত্র। সেদিক থেকে হারেম শুধু নিষিদ্ধ এলাকা নয়, পবিত্র এলাকাও বটে।

পারস্যে ওঁরা বলতেন—অন্দরম। ভারতবর্ষে—অন্তঃপুর। পরবর্তীকালে কেউ কেউ জেনানাও বলতেন অবশ্য। পারসিক 'জান' শব্দের মানে—মহিলা। সেই থেকেই জানানখানা বা জেনানা। তুর্কীরা আরব্য-রীতি মেনে নিয়েছিলেন, জেনানখানাকেই নাম দিয়েছিলেন তাঁরা হারেম। কেননা, একটি শব্দে মনের কথা বোঝাতে হলে 'হারেমে'র কোন বিকল্প খুজে পাওয়া ভার। হারেম—নিষিদ্ধ এলাকা ; নিষিদ্ধ এবং যুগপৎ পবিত্র। তুর্কী ভাষায় সম্পূর্ণ শব্দটা অবশ্য 'হারেম' নয়, হারেমলিক। পুরো অর্থ—প্রাসাদের অন্দর। 'সেরাগলিও' যদি সম্পূর্ণ প্রাসাদ, হারেম তবে প্রাসাদের সেই অংশটি যেখানে বেগম বিবিরা থাকেন।

বসফরাস-এর নীল জলে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছিল অনুচ্চ একটি পাহাড়। হঠাৎ দেখা গেল পাহাড় পুষ্পিত। রাশি রাশি পাথরের ফুল যেন ফুটে বের হচ্ছে তার দেহময়। অট্টালিকার পর অট্টালিকা। রুক্ষ, আদিম পাহাড় আড়ালে চলে গেছে, তার জায়গায় গড়ে উঠছে ছবির মত এক নগরী। রাজধানী কনস্টানটিনোপল ম্লান তার কাছে। এ যেন নতুন রাজধানী। অথবা পুরানো রাজধানীরই নয়া হৃদ্‌পিণ্ড।

কথাটা মিথ্যা নয়। সারি সারি প্রাসাদ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ একটি দেওয়াল। কনস্টানটিনোপল-এর যে কোন নাগরিক জানে, জানে বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের অগণিত প্রজাও,—এই দেওয়ালের বন্ধনীতেই সাম্রাজ্যের প্রাণ-ভোমরা। কেননা—অটোমান সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতানের এটাই যথার্থ ঠিকানা। এখানেই কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের গৌরব, সুলতানের ইজ্জত। এ দেওয়াল ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ মানে সাম্রাজ্যের পতন। অতএব অত্যন্ত গুরুতর এর প্রবেশপথটি। বিশাল দোতলা তোরণ। দুই সারি ছোট ছোট জানালা। মাথায় মুকুটের মত চার কোণে চারটি মিনার। নীচে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত, সশস্ত্র প্রহরীর দল। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ জন। রাত্রে আরও একদল এসে যোগ দেবে তাদের সঙ্গে। কেননা, পৃথিবীর এই বিশেষ কোণটির রহস্য এবং গুরুত্ব রাত্রিকালে আরও বেশি।

এই তোরণটির নাম—বাব্‌-ই-হুমায়ুন। অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রাসাদ। এর ভিতর দিয়ে যে কোন প্রজা প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু 'বাব্‌-ই-হুমায়ুন' যেখানে তাকে পৌছাতে পারে সেটা প্রাসাদের অঙ্গন মাত্র। হিন্দুস্তানে এই এলাকাটার নাম ছিল—দেওয়ানখানা। বাদশার আম-দরবার বসত সেখানে। তুর্কী সুলতানের প্রাসাদে সে কাজে ব্যবহৃত হত অন্য জায়গা,—প্রাঙ্গণ নয়।

প্রাঙ্গণে হাসপাতাল, রাজকীয় রুটির কারখানা, জল সরবরাহ ব্যবস্থার কেন্দ্র, জ্বালানি রাখার ব্যবস্থা, টাকশাল, খাজাঞ্চিখানা,

মাল গুদাম, আস্তাবল, এবং অন্দর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট প্রাসাদের কর্মীদের আস্তানা। এখানে দেখবার মত কিছু যদি সত্যিই থেকে থাকে তবে সে নৈঃশব্দ। অসংখ্য মানুষ আনাগোনা করছে, কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। চারদিকে অবিশ্বাস্য নীরবতা। 'মনে হচ্ছিল কোন মাছি উড়ে এসে কোথাও বসলেও শুনতে পাব বোধহয়'—লিখেছেন জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী। শুধু মন পালিয়ে আসতে চায় না, ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে অপূর্বসুন্দর ফোয়ারাটির দিকে। ওরা একে বলে জল্লাদের ফোয়ারা। কাজ শেষে জল্লাদ আর তার সহকারীরা হাতের রক্ত ধুয়ে থাকে এই ফোয়ারার জলে। পাশেই মোটামুটি উঁচু দুটি বেদী। নিহতদের মুণ্ডুগুলো সাজিয়ে রাখা হত তার উপর। উদ্দেশ্য: আসা-যাওয়ার পথে দৃশ্যটা দেখে জীবিতরা যদি কিছু শিখতে পারে।

সামনেই দ্বিতীয় প্রাচীর। তার মাঝামাঝি জায়গায় যে তোরণটি, নাম তার—'ওরতাকাপি' বা কেন্দ্রীয় তোরণ। এ তোরণ দিয়ে এগিয়ে গেলে আগন্তুক পৌঁছাবেন প্রাসাদের দ্বিতীয় মহলে, সুলতানের দরবার কক্ষে। একে বলা যেতে পারে সাম্রাজ্যের চৌকাঠ। যাঁরা সুলতানের সাক্ষাৎ-প্রার্থী, একমাত্র তাঁদেরই প্রবেশাধিকার আছে এই দরজায়। পঞ্চাশ প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে এখানেও। বিশেষ অনুমতি-পত্র ছাড়া কেউ এই তোরণের ভেতরে পা বাড়াতে পারবে না। এখানে এসে দর্শনপ্রার্থীকে নামতে হবে ঘোড়া থেকেও। 'ওরতাকাপি' দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আনাগোনা করতে পারেন একমাত্র সুলতান। অন্যরা,—তা তিনি স্বদেশ কিংবা বিদেশের যত বড় পদস্থ ব্যক্তিই হোন না কেন,—নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে পায়ে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করেন।

এ তোরণটির তুর্কী নামও ছিল একটি, 'বাব্-এল-সেলাম,'—আদাবের তোরণ। এই তোরণের গড়ন আরও মজবুত। দুই প্রস্ত লৌহদরজা বসানো এখানে, ললাটে সুলতানী 'তুগ্রা' বা

শিলমোহর। তলায় কোরাণের একটি ছত্র লেখা। এর ভেতরে আছে বৈদেশিক দূতদের থাকার জন্য কয়েকটি ঘর। অটোমান সাম্রাজ্য যখন গৌরবের শীর্ষে তখন মনোবাসনা নিবেদন করা মাত্র রাজদূতদের হাজির করা হত না সুলতানের সামনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা অপেক্ষা করতেন এই বাড়ির সুসজ্জিত ঘরগুলোতে। কখনও বা দিনের পর দিন।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এখানে—'কেলাত ওডাসি' বা জল্লাদের ঘর। ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ। নীচে কারাগার। উপরে থাকে ঘাতক, নীচে—শিকার। হত্যার পর অপরাধীদের মুণ্ডুগুলো সাজিয়ে রাখা হত বাইরের দেওয়ালে খুঁটির মাথায়। এ বন্দোবস্ত উচ্চপদস্থ বা গণ্যমান্য অপরাধীদের জন্য। সাধারণ অপরাধীর জন্য বরাদ্দ 'বাব্-ই-হুমায়ুনে'র পরে ওই বাঁধানো চত্বর দুটো। পাশেই একটা কাগজে লিখে রাখা হত—কী অপরাধে গর্দান গেল কার। এর পর আসল দর্শনীয়, সুলতানের দরবার কক্ষ। দৈর্ঘ্যে ৪৫৯ ফুট, প্রস্থ—৩৬১ ফুট; এই আশ্চর্যসুন্দর আসর থেকেই শাসিত হয় বিশাল সাম্রাজ্য। সপ্তাহে চার দিন সপারিষদ সুলতান এসে এখানে বসেন,—আর্জি নিয়ে প্রজারা এসে সামনে দাঁড়ায়। তিনি বিচার করেন, আদেশ দেন, নির্দেশ পাঠান। চোখ ধাঁধানো সেই সভা। জমকালো পোশাকে চারপাশে বসে আছেন রাজ্যের প্রধান আমীর ওমরাহের দল, গ্রাণ্ড উজির এবং অমাত্যবর্গ; মাঝখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট সুলতান স্বয়ং। দরবারী ভোজসভাগুলোও এখানেই বসে। সুলতানের নিজস্ব রসুইখানা ছাড়াও কাছেই এক সারি রান্নাঘর আছে সে-সব মহোৎসবের খানা বানাবার জন্য। আর আছে—'ইকাজাইন' বা সুলতানের আপন খাজাঞ্চিখানা, 'সিলা মুজেসি' বা একটি অস্ত্র-শস্ত্রের যাদুঘর, সুলতানের অশ্বশালা (দু'হাজার থেকে চার হাজার ঘোড়া থাকত তুর্কী সুলতানদের), ইত্যাদি ইত্যাদি।

দরবার কক্ষে সশরীরে হাজির থাকা প্রথমদিককার সুলতানেরা

পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। রীতি পাল্টাল পরবর্তীকালে, সুলেমানের আমলে। তিনি দেওয়ালের মাথায় ঝারোকা খাটানো গবাক্ষ বসালেন। বিলাসী সুলতান অবসর পেলে কখনও কখনও সকলের অলক্ষ্যে সেখানে এসে বসতেন, রাজ্য কেমন চলেছে তা বুঝবার চেষ্টা করতেন। এই অদৃশ্য চক্ষুটির ভয়ে দরবার সাবধানে চলত বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন—এই গবাক্ষ থেকেই শুরু তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন অধ্যায়। প্রজার সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে, দরবারে এসে বসবার মত সময়ও আর হাতে নেই সৌখিন সুলতানের। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল, তুর্কী শাসকের আকর্ষণ তখন দেওয়ানখানায় নয়, তারও পিছনে,—হারেমলিকে।

হারেমলিকে যেতে হবে এই দ্বিতীয় অঙ্গন পার হয়ে, তৃতীয় তোরণ দিয়ে। সে তোরণের নাম—'বাব্-ই-সাদত' বা পরম সুখের দরওয়াজা। অবশ্য ইচ্ছে করলেই এ দরজায় পা দেওয়া যায় না। একজন পশ্চিমী দর্শক, স্যার জর্জ ইয়ং লিখেছেন—হারেম আর তার হৃদ্‌পিণ্ড 'হিরকাই সোরিফ ওসাকি' বা চেম্বার অব দি হোলি ম্যানটল—পৃথিবীতে সব চেয়ে অজ্ঞাত দুটি স্থান। এভারেস্ট এবং মেরুর মতই তা বিশ্বমানুষের নাগালের বাইরে। ঐতিহাসিকরা বলেন—কয়েকশ' বছরে বাইরের যে সব ভাগ্যবান এই মহলে পা দিতে পেরেছেন সংখ্যায় তাঁরা বড়জোর এক ডজন। দ্বিতীয় কক্ষটিও হারেমেই। সেখানে আছে নানা পবিত্র ধর্মীয় স্মারক।

এমন কি শ্রমিকেরাও যখন কাজ করতে যায় ভেতরে তখন তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করা হয় তাদের। সেই সঙ্গে লিখে রাখা হয় চেহারা এবং চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এ-ব্যাপারে সব দেশের রাজা-বাদশাই অতি সতর্ক। তুর্কী হারেমে সব ক্রীতদাসের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসের। তাদের মধ্যে যারা চিকিৎসক তারাও যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করত তখন দু' পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত খোজা প্রহরীর দল। মুঘল হারেমে পশ্চিমের এক

অভিযাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাশ্মীরী শালে ঢেকে, অন্ধের মত হাত ধরে। রোগী দেখার সময়েও রোগীর একখানা হাত ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতেন না চিকিৎসকরা। একজন পশ্চিমী চিকিৎসক লিখেছেন—তার পরও সন্দেহ যেন থেকেই যেত ওঁদের মনে। একবার মশারির তলা থেকে হাত বাড়ালেন পর্দানসীন রোগিণী। তাঁর হাতখানা হাতে তুলেই দৃঢ় স্বরে আমি বললাম, এ হাত তো কোন স্ত্রীলোকের নয়। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠে ঢাকনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এলেন বাদশাহ,—আমি তোমাকে পরখ করছিলাম।

'বাব -ই-সাদত' বা পরম সুখের তোরণ পার হলেই দর্শক পৌছে যাবেন খাস বেহস্তে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। প্রাসাদের মানচিত্র এখানে যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনই জটিল। তোরণের পরেই প্রাচীরের গা ঘেঁষে এক সার ঘর। এখানে থাকে শ্বেতাঙ্গ খোজার দল। এদের কথা পরে বলা হয়েছে। এদের ব্যারাকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে তোরণের দিকে পিঠ রেখে তাকালে চোখে পড়বে তিনটি স্বতন্ত্র এলাকা।

প্রথম এলাকাটিকে আমরা তৃতীয় মহল বলতে পারি। এখানে আছে প্রাসাদের বিদ্যালয়, আরও একটি খাজাঞ্চিখানা, ধর্মীয় স্মারক দ্রব্যাদির ওই সংগ্রহশালা, জনৈক সুলতানের একটি স্নানঘর, একটি মসজিদ, একটি লাইব্রেরি, একটি যাদুঘর এবং আরও কয়েকটি অট্টালিকা। এর মধ্যে বিদ্যালয়টির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুলতানের বালক ভৃত্যদের 'মানুষ' করার জন্য। সাধারণতঃ ওরা ছিল ভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত ভিন্ন দেশের সন্তান। পরদেশীদের আপন করে নিতে হবে বই কি! নিজেদের মনের মত করে গড়ে নিতে হবে।

কড়ির বিনিময়ে অথবা তলোয়ারের বলে সংগ্রহ করা হয়েছিল ওদের। সুতরাং তুর্কী আদব-কায়দায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে

একটা শিক্ষাকেন্দ্র থাকা চাই। শুধু দরবারী আদব-কায়দা নয়, শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতিতেও ওরা যাতে তুরস্কের সুলতানের যোগ্য দাস হতে পারে তার জন্যও চেষ্টার অন্ত ছিল না এই বিদ্যালয়ে। অর্থাৎ, ধর্ম, সমর-বিদ্যা সবই শেখান হত এখানে। প্রাসাদের সীমানার বাইরেও এজন্য বিদ্যালয় ছিল কয়েকটি। কিন্তু সব চেয়ে খ্যাত এটিই। কোন তুর্কী বালক এখানে পড়ত না। ছাত্ররা সবাই বিদেশী—অস্ট্রিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান, গ্রীক, ইতালীয়ান, বোহেমিয়ান, জার্মান, সুইস ইত্যাদি নানা জাতির। সংখ্যায় ওরা পাঁচশ' থেকে আটশ'। ছাত্রজীবনের প্রথম বছরে ওরা দৈনিক দুই 'আসপার' করে হাত-খরচ পেত, দ্বিতীয় বছরে পেত তিন 'আসপার', তৃতীয় বছরে পেত—চার 'আসপার'। 'আসপার' তুর্কী মুদ্রা। বছরে দুই প্রস্ত লাল রঙের জমকালো পোশাক দেওয়া হত প্রত্যেক ছাত্রকে। গরমের সময়ে পরার জন্য দেওয়া হত আর দুই প্রস্ত সাদা আলখাল্লা।

কড়াকড়ি রীতিনীতি এই বিদ্যালয়ে। শ্বেতাঙ্গ খোজার দল অষ্টপ্রহর নজর রাখত ওদের উপর। তার মধ্যেই যথারীতি অনভিপ্রেতও ঘটত। উপায় কী? কোন কোন সুলতান বিকৃত মনের পুরুষ। হারেমের মেয়েদের চেয়েও তাঁরা নাকি ভালবাসতেন শ্বেতাঙ্গ কিশোর তরুণের সাহচর্য। একজন পশ্চিমী আগন্তুক লিখেছেন—নানা আকথা-কুকথা শোনা যায় এই বালকদের সম্পর্কে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ অঞ্চলে এসব আচারের নাকি রীতিমত চল। আর একজন দর্শক লিখেছেন—এই বিদ্যালয়ের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে একটি সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করত। তাদের মতিগতি বোঝা খুবই শক্ত। কোন বিকৃত আচারের জন্য ধরা পড়লে অবশ্য চরম শাস্তি দেওয়া হত। আধমরা করে দেওয়ালের বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া হত অপরাধীকে। তা হলেও বলা চলে না ওরা বশ মেনেছিল। একজন লিখেছেন—ভাগ্যিস, এই প্রাসাদে হারেম যুক্ত হয়েছে অনেক

পরে, তা না হলে কী সব কাণ্ড ঘটত কে জানে। সুলতানের মত সুলতানারাও নিশ্চয় হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকতেন ওদের।

এর পরে চতুর্থ মহল বা 'দোরদুনচু আব্‌লু'। সেখানে যেতে হলে প্রবেশ পথের ডাইনে পড়বে সুলতানের আর একটি খাজাঞ্চিখানা, বাঁয়ে—দাওয়াই এবং পানীয়ের ঘর। এখানে বিশ্ব মন্থন করে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে নানা ধরনের বিষ এবং বিষ প্রতিষেধক, পানীয়, আতর, আরক ইত্যাদি। এ মহলে ঘর-বাড়ি কম। জলাশয়, বাগান ইত্যাদি শোভিত এই বিস্তীর্ণ চত্বরে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান মাত্র দুটি। প্রথমটি প্রাসাদের অস্ত্রোপচার গৃহ। ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী সুলতান-তনয় থেকে শুরু করে ভৃত্যদল—সকলকে শুদ্ধ করা হত এখানে। দ্বিতীয়টি 'হেকিম বাসি ওডাসি' বা প্রাসাদের প্রধান হেকিমের চেম্বার। এ ছাড়া ছিল কয়েকটি কারুকার্যখচিত অনুপম পর্যবেক্ষণ চৌকি। তাদের যে কোন একটিতে উঠে দাঁড়ালে তবেই দেখা যাবে প্রাসাদের আসল রহস্যকেন্দ্র—হারেম।

হারেমের দুটি ভাগ। এক—'হারেমলিক', দ্বিতীয়—'সেলামলিক।' প্রথমে 'সেলামলিক'-এর দিকেই একনজর তাকানো যাক। এই অংশটাকে বলা চলে হারেমের সদর। অন্দর—খাস হারেম। এ এলাকা পুরুষের, অর্থাৎ সুলতানের। এখানেই তাঁর স্নানঘর, বৈঠকখানা, শয়নকক্ষ। বেগম বাঁদীরা অবশ্য কখনও কখনও উঁকি দেয় এদিকে। কেননা, যদিও পুরুষদের মহল, তাহলেও 'সেলামলিকে' গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভবন আছে। অস্ত্রোপচারের যে ঘরটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কার্যতঃ সেটি 'সেলামলিক'-এর চৌহদ্দিতে পড়ে। আপন বালকের ওপর অস্ত্রোপচারের সময় বাঁদীর সঙ্গে বেগমও কখনও কখনও সুযোগ পেলে হাজির থাকতেন সেখানে। দ্বিতীয়ত, এখানেই সুলতানের সিংহাসন-ঘর। সেখানেও মাঝে মাঝে দেখা যেত হারেমের মেয়েদের। কোন আনন্দ-অনুষ্ঠানের দিনে সুলতান নিজেই ডেকে পাঠাতেন ওদের। ডাক

পড়ত তাদের অন্য সময়ও। অবশ্য অন্য ঘরে। সে কথা পরে।

'হারেমলিক'-এ অন্যতম দ্রষ্টব্য 'কাফেস্' বা খাঁচা, অর্থাৎ হারেমের কারাগারটি। একজন গবেষক লিখেছেন—এই কারাগার যে পরিমাণ নিষ্ঠুরতা, যন্ত্রণা এবং রক্তপাত প্রত্যক্ষ করেছে, ইউরোপের কোন রাজপ্রাসাদ কোনদিন তা দেখেনি। সিদ্ধান্তটা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। এখানে তার সুযোগ নেই। আমরা শুধু এইটুকুই মেনে নিচ্ছি যে, 'কাফেস্' একটি ভয়াবহ যুগের প্রতীক। হারেমের দুর্বলতা, হারেমের ষড়যন্ত্র, হারেমের অক্ষমতা এবং নিষ্ঠুরতা—এক কথায় হারেমের যাবতীয় অনাচারের একটি মৌন স্মারক এই 'কাফেস্'।

সুলতান তৃতীয় মুরাদের হারেম আকারে বেশ বড় ছিল। স্বভাবতঃই সন্তান সংখ্যাও ছিল তাঁর অনেক। এক হিসাবে জানা যায়, মুরাদ একশ' তিনটি ছেলেমেয়ের জনক ছিলেন। এদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুসময়ে বেঁচে ছিল কুড়িটি পুত্রসন্তান ও সাতাশটি কন্যা। তাঁর পরে সিংহাসনে বসলেন সুলতানের জ্যেষ্ঠ তনয়। ইতিহাসে নাম তাঁর তৃতীয় মহম্মদ। তিনি বাকি উনিশ ভাইকে হত্যা করলেন। পিতার সাতজন শয্যাসঙ্গিনী তখন সন্তানসম্ভবা। নবীন সুলতানের আদেশে তাদেরও বিসর্জন দেওয়া হল সমুদ্রের জলে। সিংহাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ থাকতে চান মহম্মদ। এটা তাঁর কোন ব্যক্তিগত খেয়াল নয়, এই প্রাসাদে বরাবর তা-ই করা হত। হঠাৎ ছেদ পড়ল তাতে। কেন কে জানে, স্থির হল অতঃপর আর সুলতানের বেওয়ারিশ সন্তানদের হত্যা করা হবে না,—তাদের আটকে রাখা হবে কারাগারে। প্রয়োজন হলে জল্লাদ পাঠানো যাবে সেখানে, প্রয়োজন হলে শূন্য সিংহাসনে বসানোর মত লোক পাওয়া যাবে অতি সহজে। সুতরাং তৈরী হল—'কাফেস্'।

দোতলা বাড়ি। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। তারই মধ্যে বাস করে বেচারা সুলতান-তনয়রা। অদূরেই দরবার, মন্ত্রণাকক্ষ।

সেখানে কী হচ্ছে, সুলতানের আপন সন্তান হয়েও সে-সব খবর জানবার অধিকার নেই তাদের। শিক্ষাদীক্ষারও কোনও বন্দোবস্ত নেই হতভাগ্যদের জন্য। অন্ধ, খঞ্জ, উন্মাদ, অশিক্ষিত এবং অতৃপ্ত কতগুলো মানুষের ভিড় এখানে। এদের প্রমোদ দানের জন্য হারেম থেকে আধবয়সী কিছু বন্ধ্যা রমণীকে ছুঁড়ে দেওয়া হত। শস্যের নামে কিছু খোসা। বরাদ্দ একেবারে কম নয়, প্রত্যেকের ভাগে গড়ে এক ডজন করে ক্রীড়াবস্তু। তৎসহ খোজা ও আনুষঙ্গিক উপচার। কখনও কখনও এদের কারও সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত কোন বন্দী। কখনও বা প্রাসাদ-হেকিমের সব বিদ্যাকে বিফল প্রমাণ করে সন্তানবতী হত সেই রঙ্গিনী দলের কেউ। সে ক্ষেত্রে কারও সাধ্য নেই ওদের বাঁচিয়ে রাখে, দু'জনেরই প্রাণদণ্ড অবধারিত।

কেউ কেউ তারই মধ্যে বেঁচে থাকতেন। কেউ কেউ ফিরে আসতেন সিংহাসনেও। ইব্রাহিম ফিরে এসেছিলেন। উনচল্লিশ বছর পরে ফিরে এসেছিলেন দ্বিতীয় সুলেমান। ওঁরা তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। বিশেষতঃ, ইব্রাহিম। তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনী পরে শোনা যাবে। বন্দীরা স্বভাবতঃই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজত। ছাড়া পাওয়ার পর তারা যেন হিংস্র জন্তু। ১৮০৭ সনের কথা। প্রাসাদের বিরাট রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহী হল। তাদের দাবি—সিংহাসন থেকে নেমে 'কাফেস্'-এ ঢুকতে হবে সুলতান তৃতীয় সেলিমকে। তিনি রাজী হলেন। ওরা কারাগার থেকে মুক্ত করে এনে সিংহাসনে বসাল ভূতপূর্ব বন্দী মুস্তাফাকে। মুস্তাফা সুলতানের খুড়তুতো ভাই। সুলতানের হুকুমেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। সিংহাসনে বসলেন বটে, কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত হল মুস্তাফা অক্ষম শাসক। সেলিমকে মুক্ত করার জন্য প্রাসাদ লক্ষ্য করে এগিয়ে এলেন তাঁর এক ভূতপূর্ব ঘনিষ্ঠ সহচর। খবর পেয়ে হুকুম দিলেন মুস্তাফা,—হত্যা কর বন্দীকে। ঘাতকেরা কারাগারের দুয়ার খুলে ভিতরে ঢুকলেন। সেলিম প্রাণপণে লড়াই

করলেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল তাঁকে। ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল ভূতপূর্ব সুলতানকে। সেই মুহূর্তেই সদলবলে 'সেলামলিক'-এ এসে হাজির হলেন সেলিমের বান্ধব। কারাগারের দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন তিনি—সেলিম! সেলিম! ওরা সেলিমের মৃতদেহটা ছুঁড়ে দিল তাঁর সামনে,—এই তোমার সেলিম! রেহাই পেলেন না মুস্তাফাও. সেলিমের অনুরাগীরা সিংহাসন থেকে টেনে নামালেন তাঁকে। আবার কারাগারে ফিরে গেলেন তিনি। সিংহাসনে বসলেন—সুলতান দ্বিতীয় মামুদ।

এ ধরনের কাহিনী ভারতের ইতিহাসেও একেবারে অশ্রুত নয়। তবু তুর্কী হারেমের 'সেলামলিক'-এর এই কারাগারটির যেন তুলনা নেই। এখান থেকে 'সুবর্ণ পথ' নামে পরিচিত রাস্তাটি ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই সামনে সেই স্বর্গ, নাম যার—হারেম। কিংবা, এগিয়ে যাও 'স্নানঘরের পথ' নামে অপরিসর ওই গলিটি ধরে, তা হলেই সামনে পাবে সেই সুখের রাজ্য—হারেম। সেখানে রাশি রাশি ফুল, লঘু পাখায় গুঞ্জন করে ফিরছে একটি মাত্র ভ্রমর। নরক আর স্বর্গের মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটি দেওয়াল। এখানে কান্না, ওখানে হাসি। এখানে ক্ষুধা, ওখানে আহারে অরুচি। এখানে প্রেতিনীর মেলা, ওখানে হুরীদের খেলা। বন্দীর দীর্ঘশ্বাস দেওয়ালের ওপারে পৌঁছয় না, কিন্তু বাতাসে ভেসে আসে ওপারের খিল খিল হাসি, নূপুর-নিক্কণ, আতর গন্ধ।
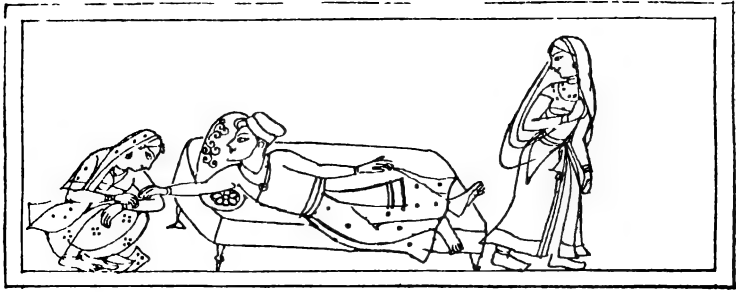
সুলতানের প্রাসাদ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট্ট একটি দেশ, তবে তাঁর হারেমও তাই। অসংখ্য রক্ষী এবং সাদা কালো খোজা ছাড়াও প্রাসাদে আছে একটি সামরিক বিদ্যালয়, তেরো-চৌদ্দটি মসজিদ, দশটি রসুইখানা, দুটো রুটির কারখানা, দুটো হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, হামাম, বাগিচা, হ্রদ ইত্যাদি। এসব আয়োজনের অধিকাংশই চোখে পড়বে খাস হারেমে। শুধু ফোয়ারা, বাগান, রত্নশালা, হামাম আর বস্ত্রালয় নয়,—হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ধোপাখানা, মসজিদ ইত্যাদিও আছে এখানে। এই নিষিদ্ধ দেশে ঢোকবার দুটো পথের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ; 'সুবর্ণ পথ' আর 'স্নানঘরের পথ'—'আলতিনইয়ল' আর 'হামাম ইয়লু'। কিন্তু এ পথে পা বাড়াবার অধিকারী একমাত্র 'সেলামলিক'-এর প্রবলপ্রতাপান্বিত বাসিন্দা ; অর্থাৎ স্বয়ং সুলতান। এছাড়াও খাস হারেমে যাতায়াতের আরও কয়েকটি দরওয়াজা ছিল। তার মধ্যে প্রধানটির নাম ছিল—'হারেম কুমলে কাপিসি'। 'আরাবা কাপিসি' নামে একটি তোরণ ছিল গাড়ির জন্য। তাছাড়াও ছিল 'কুসানে কাপিসি' এবং দু' দুটো 'পর্দে কাপিসি'। 'পর্দে কাপিসি' নাকি মোটা কাপড়ে বা পর্দায় ঢাকা থাকত সব সময়। বাইরে থেকে তো বটেই, ভেতর

থেকেও পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দেওয়ার সাধ্য নেই কারও। প্রতিটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ভীষণদর্শন প্রহরী। প্রত্যেকে তারা কৃষ্ণাঙ্গ এবং প্রত্যেকে খোজা।

সুলতানকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে একবার উঁকি দেওয়া যাক হারেমের সার সার ঘরগুলোতে। মেলিং নামে এক পশ্চিমী স্থপতি সুলতান তৃতীয় সেলিমের আমলে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর হারেমটিকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার। সুলতানের এক বোন ছিলেন হারেমের তরফ থেকে এ ব্যাপারে সব চেয়ে উদ্যোগী। তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলতে হত মেলিংকে। কখনও কখনও সরেজমিনে ঘরগুলোর অবস্থা দেখার জন্য আসতে হত অন্দরের অন্দরেও। তাঁর তুলিতে আকা তুর্কী হারেমের এক টুকরো ছবি :

চিত্রের কেন্দ্রে একজন বেগম আর একজন খোজা। পোশাক দেখেই বোঝা যায় এ বেগম হারেমের অধিকর্ত্রী। খোজা—উচ্চপদস্থ কোন দাস। বেগম নিশ্চয় কোন কাজের কথা বলছেন ওকে। ডানদিকে এক কোণে বসে তিনটি মেয়ে 'তান্দির' বা কাঠকয়লার আগুনে পা গরম করছে। এরাও বেগম। কী বলছে ওরা নিজেদের মধ্যে? আমরা জানি না। মেলিংও জানতেন না। আর এক কোণে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে দু'জন বেগম। যেন দুই সতীন নয়, দুই বান্ধবী। এদের মধ্যে সম্পর্ক যদি অন্য ধরনের হয়—বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। অন্তত: মেলিং তাই মনে করেন। মাঝখানে একাকিনী দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। সাদাসিধে পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে একজন ক্রীতদাসী। বাঁ দিকে একটি রমণী বসে বসে খাবার খাচ্ছে। সেও বেগম নিশ্চয়। এবং সম্ভবত সুলতানের সোহাগীদের অন্যতম সে। কারণ ওদিকে দেখা যাচ্ছে, একটি হলে বসে একসঙ্গে খাচ্ছে সাত জন।

ছবির, হারেমের নয়, একতলায় মসজিদ-দৃশ্য। প্রার্থনার নানা ভঙ্গী দেখিয়েছেন এখানে মেলিং। দোতলার উপরে দেখিয়েছেন

কয়েকটি শোবার ঘর। মেয়েরা রাত্তিরের জন্য শয্যা তৈরি করছে। দিনের বেলায় বালিশ ইত্যাদি তুলে রাখা হয়। কোথায়, কী ভাবে তাও দেখিয়েছেন চিত্রকর। গবেষকরা বলেন, মেলিং-এর চিত্রে একটি জিনিসের অভাব। প্রত্যেক শোবার ঘরের দেওয়ালে একটি করে ছোট্ট 'দেওয়াল-ফোয়ারা', অর্থাৎ বেসিন থাকত, তা তিনি দেখাননি। হয়ত তখনও তার ব্যবহার শুরু হয়নি।

মহামান্য সুলতান আরও কিছুক্ষণ অনুপস্থিত থাকলে ক্ষতি নেই। সত্য, তাঁরই নামে, তাঁরই জন্যে, তাঁরই পরিকল্পনা মত সাজানো হয়েছে এই নন্দনলোক, কিন্তু হারেমের প্রভু হলেও কার্যতঃ তিনি বাইরের মানুষ। এখানে প্রকৃত কর্ত্রী যিনি তিনি সুলতান-জননী,—'সুলতানা ভালিদ'। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'পুরুষের স্ত্রী থাকতে পারে অসংখ্য, কিন্তু মা একজনই।' স্বভাবতঃই সুলতান-জননীর সম্মান সকলের উপরে। হিন্দুস্থানে বলা হত তাঁকে—'পাদশাহী বেগম'। এখানেও তিনি সম্মানিত মহিলা। আর সবাই মর্যাদায় তাঁর পরে।

তুরস্কে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জননীর পদবী—'বাসখাদিন এফেন্দি'। মুঘল হারেমে তিনি—'খাসমহল'। তারপর দুই, তিন, চার,—আরও তিনজন প্রিয় বেগম। তারা 'হানুম এফেন্দি'। অন্য নাম 'খাদিন'। এই চারজনকে বাদ দিলে তিনশ' কিংবা বারোশ', যত বিরাটই হোক না কেন বেগমবাহিনী, ওরা সবাই সুলতানের শয্যাসহচরী মাত্র। ওঁরা বলতেন—'ওদালিক'। তাদের একমাত্র গৌরব, সুলতানকে একদিন তারা কাছে পেয়েছিল, ক্রীড়াচ্ছলে কয়েকটি আনন্দিত মুহূর্ত কেড়ে নিতে পেরেছিল। ঘরে ঘরে প্রত্যেকে ওরা আশা করে আছে—সে সুযোগ আবার কোন রাত্রে নিশ্চয় আসবে। হাতের সর্বশেষ গোলাপটিকে আবর্জনা কুণ্ডে ছুঁড়ে দিয়ে হয়ত বাদশাহ আবার একদিন ওর দিকে ফিরে তাকাবেন, রুমালের ইশারায় কাছে ডাকবেন। সে রাত্রির প্রতীক্ষায়ই

প্রতি সন্ধ্যায় গুণ গুণ করে গান করে মেয়েটি, চোখে সুরমা টানে।

এই উপপত্নী দল ছাড়াও ঝাঁক ঝাঁক হুরী সুলতানী-বেহস্তে। হারেম একদিক থেকে এক প্রমীলা-রাজ্য। এখানে পুরুষ মাত্র একজনই। বিশেষ করে সুলতানের তা-ই ধারণা। খোজাদের পুরুষ হিসাবে গণ্য করলে তবে হারেম আর হারেম থাকে না, একে নিয়ে গর্বের কোন অর্থ হয় না। তাই নয় কি? অতএব পুরোপুরি প্রমীলা-রাজ্য হিসাবেই মনে মনে কল্পনা করে হারেম সাজিয়েছিলেন সুলতান বাদশাহরা। এখানে অনেক কাজই মেয়েরা করে। তারা অবশ্য বাঁদী। কিন্তু সেটাই একমাত্র পরিচয় নয় তাদের। বাঁদীদের কর্ত্রী যে, পদবী তার 'কিয়ায়া খাতুন', কিংবা 'কেত্‌খুদা'। মেয়ে মহলের সে সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তার পর পদাধিকারে দ্বিতীয় স্থান 'হাজিনদার ওয়াস্তা' বা 'হাসনাদার'-এর। সে কোষাধ্যক্ষ। এই দু'জনের পরে যারা, তারা 'কাল্‌ফা'। সবাই ওরা এক স্তরের বাঁদী, কিন্তু সকলের কাজ এক নয়। একজন হয়ত পোশাক বিভাগের কর্ত্রী, একজন গহনাপত্তরের। কারও দায়িত্ব হয়ত রসুইখানা, কারও তোষাখানা। কেউ রক্ষী, কেউ সহচরী, কেউ কোরাণ পড়ে, কেউ নাচে গায়। হারেমে যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না।

এ-ব্যাপারে মুঘল হারেমে যেন আরও এলাহি বন্দোবস্ত। আউরঙ্গজেবের আমলে মুঘল হারেমে নারী ছিল দু'হাজার। রক্ষিতাদের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেককে একটি করে আলাদা সংসার পেতে দিয়েছিলেন বাদশাহ। প্রত্যেকের অধীনে থাকত দশ-বারোজন করে বাঁদী। বাঁদীদের ওপরে আছে একজন করে মেট্রন। তাদের মাইনে ছিল নাকি মাসে তিনশ' থেকে পাঁচশ' টাকা। বাঁদীরা পেত পঞ্চাশ থেকে দু'শ টাকা।

বেগমরাও সংখ্যায় কম ছিলেন না। মানুচিসির তালিকা অনুযায়ী সেদিনের মুঘল হারেমের প্রধান ক'জন বেগম এবং সুলতানার নাম—

তাজমহল, নূরমহল, ছত্রবতী, জানি বেগম, পার আনোয়ার বেগম, হুর্-ই-হুরান বেগম ইত্যাদি। শেষ নামটির বক্তব্য—'রাজকন্যাদের মধ্যে হীরা' তিনি। নামের বাহার ছিল সকলেরই। প্রত্যেকে যেন কবিতার এক একটি ছত্র। রূপও নিশ্চয় ছিল ওদের অঙ্গে, নয়ত সৌখিন বাদশাহ কেন ঠাঁই দেবেন ওদের প্রাসাদে। কিন্তু হারেম স্বাভাবিক ঠিকানা নয়, রূপ-মহল হলেও মেয়েদের রূপ যেন এখানে আরও ক্ষণস্থায়ী। বিশেষতঃ সোহাগী বেগমদের। তুর্কী হারেমের খাদিনদের রূপ বর্ণনা করছেন একজন লেখক :

চুলে হেনা মাখত ওরা। হাতে, পায়ে, নখেও। পৃথিবীর আর কোথাও এত প্রসাধনী ব্যবহার করে না কেউ। ওরা ঠোঁটে রঙ মাখে। হয়ত কোন গ্রীক রমনীর কাছ থেকে শিখেছে। ভুরুতে মাখে ঘন কাজল, দু'টো ভ্রূ কখনও বা জুড়ে দেয় তাতে। কিন্তু এতকিছুর পরও সুরূপা মনে হয় না ওদের। ওদের শরীর অত্যন্ত মোটা, বুক ভারি, পা বাঁকা। পায়ের এই হাল হয়েছে সম্ভবত ওরা আসন করে বসে বলে। শরীরে মেদ বৃদ্ধির হেতু ওদের খাদ্য। প্রচুর খায় ওরা, পুরুষদের চেয়েও বেশি। আর খায় কি জানো? ভাত, মাংস, আর মাখন। মদ নিষিদ্ধ হারেমে, ওরা তাই চিনির জল খায়!

মুঘল হারেমের বিখ্যাত সুন্দরীরাও ক'দিন নিজেদের রূপ বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন কে জানে? আমরা শুধু জানি, অতিশয় রুচিবান বাদশাহেরও কোন অসুবিধা ছিল না তাতে। কেননা, শুধু জনাকয় বেগম নয়, ভাণ্ডার তারপরও অফুরন্ত। আউরঙ্গজেবের সময়ে হারেমের বিপুল রক্ষিতা-বাহিনীর কয়েকজনের নাম—বদম চশম, নজুক বদম, মতলব, পেয়ার ইত্যাদি। শেষ দুটি নামের অর্থ স্পষ্ট, প্রথম নাম দু'টির মানে নাকি—উজ্জ্বল-নয়না আর সুন্দর-দেহী।

নামে হয়ত কিছুই বোঝা যায় না। তবু নামগুলো শুনবার মত। মেট্রন বা বিভাগীয় প্রধানা বাঁদীদের কয়েকজনের নাম—ফাতিমা বানু (মানে—দার্শনিক মহিলা), কাদির বিবি বানু

(ক্ষমতাশালিনী), রোশনবা বান্থ (সাকি), গুল সুলতান বানু (বাদশাহী ফুল) ইত্যাদি।

তারপর নৃত্যগীত বিভাগ। সেখানে একসময় ছিল—সুন্দর বাঈ, সুরস বাঈ, চৌহলা বাঈ, জালিয়া বাঈ, নয়ন জোত বাঈ, কস্তুরী বাঈ, চঞ্চল বাঈ—এবং আরও কত কি। সামান্য যে বাঁদী, সেও যেন দাসী মাত্র নয়, নাম থেকে অনুমান করা যায় তাদেরও দেয় কিছু ছিল। মুঘল হারেমের কয়েকটি বাঁদীর নাম—গুলাব, চামেলি, নার্গিস, কেনার, গুল-ই-বদম্, ইয়াসমিন্ (জুঁই), গুল-ই-আব্বাসি, রাণা গুল, আনারকলি। অধিকাংশই ফুলের নাম। এত যত্ন করে দেশ-বিদেশ থেকে চয়ন করে আনা ফুল, সে কি শুধু অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে ছিটিয়ে রাখার জন্য? মাঝে মাঝে তারই কোন একটিকে সুলতান হাতে তুলে নিতেন বইকি!

ফিরে আসা যাক তুর্কী হারেমে।

'সোনালী পথে'র দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রূপসীর দল। বিশ্ব মথিত করে নিপুণ, নিষ্ঠুর হাতে সংগ্রহ করে আনা মুঠো মুঠো মণি-মাণিক্য, হীরে-জহরত। পুরানোরা আড় নয়নে বার বার তাকাচ্ছে সদ্য তুলে আনা জুঁই ফুলটির দিকে; বাঁদী বটে, কিন্তু অনাঘ্রাতা পুষ্পের সৌরভ যেন তার অঙ্গ ঘিরে।

বুক দুরু দুরু সকলেরই। কিন্তু জীবনে এই প্রথম যে দাঁড়াল এ পথের বাঁকে, হারেমের নৈশ হাটে, তার মনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা হয় না কারও। গোটা হারেম এই রাত্রিটির জন্যই তিল তিল করে তৈরি করেছে মেয়েটিকে, সেই কোন্ বিকেল থেকে সযত্নে সাজিয়েছে। কেউ সানন্দে, কেউ সখেদে।

হারেমের খোজা-প্রধান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্নান করিয়েছে সুন্দরীকে। স্নান শেষে প্রসাধন। বাঁদীরা সমস্ত বিদ্যা উজাড় করে যত্ন ভরে সাজিয়েছে তাকে। ক'দিন আগেও ওদেরই একজন ছিল সে। আতরগন্ধের সঙ্গে অতএব সাজঘরের হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাসও মিশেছে

হয়ত কিছু কিছু। ওরা জানে এ মেয়ে সুলতানের আপ্‌না-পছন্দ্‌। কোন ব্যবসায়ী উপহার পাঠায়নি ওকে। সে ক্ষেত্রে সহজ নিয়ম। তে-রাত্তিরের পরীক্ষা। চতুর্থ দিন ভোরে জানতে পারবে ব্যবসায়ী তার সওদা বিক্রি হল কিনা,—মেয়েটি সুলতানের দেওয়া কোন নাম উপহার পেয়েছে কিনা। তা না পেলে, অর্থাৎ সুলতান খারিজ করে দিলে, সে মেয়ে মাথা নীচু করে আবার ফিরে যাবে নতুন কোন হাটে, প্রাসাদের তুয়ার চিরকালের জন্য তার কাছে বন্ধ। নসিব একেবারে মন্দ না হলে হয়ত ঠাঁই পাবে কোন আমীর ওমরাহ কিংবা পাশার ঘরে। নয়ত আর সকলের ক্ষেত্রে যা হয়, ওর ক্ষেত্রেও তা-ই হবে, নিক্ষিপ্ত হবে সত্যিকারের বাজারে,—রাজধানীর পঙ্ককুণ্ডে। বাঁদীরা মনে মনে খেদ করত সে হতভাগীর জন্য। কিন্তু সান্ত্বনা, এই পরিণতির জন্য দায়ী নয় ওরা। আজ এ কৈফিয়ত অচল দাসী হলেও ওদের সামনে-বসা এই মেয়েটি স্বয়ং সুলতানের মনোনীতা। সুতরাং, নিজেদের কৃত্যটুকুতে কোন ফাঁক রাখা ঠিক নয়। তাতে নিজেদেরও বিপদের সম্ভাবনা।

স্নানের আগেই দেহ নির্লোম করা হয়েছিল মেয়েটির। স্নানের পর ফুলেল-তেল, আতর, মেহেদি, কাজল, সুরমা—আরও কত কী! 'লিঙ্গেরী' অর্থাৎ পোশাক বিভাগের অধিশ্বরী যে বাঁদী সেও বেছে বেছে রং মিলিয়ে সবচেয়ে ভাল পোশাকটি দিয়েছে আজ ওকে। মিছিমিছি হিংসে করে একটি মেয়ের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তোলা ঠিক নয়। সেটা অধর্ম।—তাছাড়া, ছাই, আমাদের কি আর সে বয়স আছে? বুড়ি হয়ে গেছি সেই কবে! মসলিনের কোর্তাটি হাতে তুলে দিতে দিতে রসিকতা করেছিল লিঙ্গেরী,—দেখিস, হেরে আসিস না যেন!

প্রতীক্ষা শেষ হল। 'কিস্‌লার আগা' অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ খোজাদের প্রধান হাঁক দিল—সুলতান আসছেন। পরক্ষণেই 'সেলামলিক'-এর সীমান্তের ওপারে দেখা গেল সুলতানকে। তার পরেই তিনি

'সোনালী পথের' এই প্রান্তে। লঘু পায়ে হেঁটে আসছেন বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। মুখে স্মিত হাসি, চোখে ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে দৃষ্টি শিকারীর কিংবা প্রেমিকের, বলা শক্ত। অঘটন কিছু ঘটল না। যা প্রত্যাশিত ছিল তাই হল। চলতে চলতেই এক সময় হাতের বাহারি রুমালটা তিনি তুলে দিলেন মেয়েটির হাতে। হয়ত নিজের সৌভাগ্যকে তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না বেচারা, ধরতে গিয়েও ধরতে পারল না ; কেঁপে উঠেছিল হাতটা, হাতের রুমাল তাই হাত ফস্কে লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয়। আর কেউ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই 'কিস্‌লার আগা' কুড়িয়ে নিল সেটি। তারপর গম্ভীর মুখে তুলে দিল মনোনীতার হাতে।—ভাগ্যিস, সুলতান পিছু তাকাননি! মনে মনে জিভ কাটল মেয়েটি।

রাত্রির মত অন্যদের কর্তব্য এখানেই শেষ। সবাই জেনে গেছে কার হাতে রেশমী রুমাল—বাদশাহী আমন্ত্রণ-পত্র। সে মেয়েকে সবাই বলবে 'গুজ্‌দে'—নজরে পড়া।

তার পরেও অনেক অনুষ্ঠান। সুলতানের শয়নকক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে যথা সময়ে খোজা এসে দাঁড়াবে সৌভাগ্যবতীর দুয়ারে। সে যখন অভিসারে বের হবে তখন আর-সব বেগমদের ঘর বন্ধ রাখতে হবে, কেউ যেন দেখতে না পারে ওকে। আগে যারা সুলতানের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, তাদের কাছে এই অভিসার হয়ত দুরূহ কোন ব্যাপার নয়। সত্য, সুলতানের কক্ষে যে কোন নারীর পক্ষে প্রতিটি রাত্রিই নব নব পরীক্ষা। তা হলেও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদের কথা এক, যার জীবনে সেটাই প্রথম রাত্রি তার কথা অন্য।

কম্পিত পায়ে সে এসে দাঁড়াল ঘরের দরজায়। সুলতান আগে থেকেই শয্যায় শায়িত। ঘরে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। একটি দরজার পাশেই। সেখানে দুঃস্বপ্নের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে

বসে আছে এক বৃদ্ধা। তার ধূসর চোখ দুটি সাবধানী-আলোর মত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুয়ারের দিকে। মেয়েটি শুনেছে, ঘণ্টা তিনেক বসে থাকবে এই বৃদ্ধা। তারপর তার ঠাঁই নেবে এসে আর-এক প্রবীণা। ওর মতই আজ সারারাত পালা করে জেগে থাকবে ওরা। সুলতান এবং তার সঙ্গিনী যখন শয্যায় তখন শুধু দরজায় প্রহরী থাকলেই চলবে না, ঘরেও জেগে বসে থাকতে হবে এদের। শঙ্কার সব রন্ধ্রগুলো বন্ধ রাখতে হবে এই আনন্দলোকে। সেটাই নাকি নিয়ম। দ্বিতীয় মোমবাতিটি জ্বলছে ফুলশয্যার পায়ের দিকে, মেঝেয়। ধীর পায়ে, ভীরু কপোতীর মত সেদিকেই এগিয়ে যাবে অভিসারিকা। পালঙ্কের পায়ে পৌঁছে নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে মেঝেয়। তারপর তেমনই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে উদিত হবে শয্যার প্রান্তে। হয়ত শুয়ে থেকেই একটি হাত সামনে বাড়িয়ে দেবেন সুলতান, হয়ত নয়। নায়ক হয়ত সে রাত্রে সত্যিই ক্লান্ত। কিংবা উদ্বিগ্ন।

অতএব তার পরের সময়টুকু আরও অনিশ্চিত, আরও গুরুতর। আবাল্য বুদ্ধিমতী হিসাবে খ্যাতি যার, সেও যেন হঠাৎ বোকা হয়ে গেছে আজ। নিপুণিকা বিহ্বল, বিমূঢ়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পরম যত্ন সহকারে আপন লাবণ্যকে ফুটিয়ে তুলেছিল সে এই রাত্রিটিরই জন্য। তবু যেন মনে হচ্ছে, ভুল হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে,—হায় ঈশ্বর!

প্রসঙ্গতঃ শয়নকক্ষের অনুষ্ঠান বিষয়ে আরও কয়েকটি তথ্য উল্লেখ্য। একজন বিদেশিনী কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুস্তাফার প্রধানা 'খাদিন'কে।—এ কেমন প্রথা, হামাগুড়ি দিয়ে শয্যায় উঠবে কেন তোমরা? মেয়েটি নাকি হেসে বলেছিল—কই, আমি তো কখনও তা করিনি, বরং সুলতান নিজেই তো হামা দিয়ে এসে উদিত হতেন আমার শয্যায়।

এ জবানবন্দী সোহাগী সুলতানার। সে সুলতানের বাঁদী ছিল

না, সুলতান ছিলেন তার বান্দা। খেয়ালী সুলতান বিনয় সহকারে তাঁর ভালবাসা নিবেদন করতেন এই সুলতানার চরণে, তাই নিজেই এসে তিনি হাজির হতেন তার কক্ষে। এবং নায়িকার যা কৃত্য, তা-ই নিষ্ঠা সহকারে পালন করতেন নায়ক। বাদশাহ যখন বাঁদীর গোলাম তখন সবই সম্ভব। কিন্তু গবেষকরা বলেন—দাসীভাবে সুলতানের শয্যায় ঠাঁই করে নেওয়াই ছিল তুর্কী হারেমে মেয়েদের পক্ষে নিয়ম।

শুধু তুরস্কে নয়। অন্যান্য দেশের হারেমেও নাকি মোটামুটি একই নিয়ম। ইউরোপীয় বাদশাহরা নাকি হাতের দস্তানাটি খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেন নায়িকার দিকে। রণে আর প্রেমে সেটাই রীতি। চীনের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনের সম্রাটরা রুমালের বদলে মনোনীতাকে আপন কক্ষে ডাকতেন একটি কাঠের চাকতির মাধ্যমে। তাতে লেখা থাকত কা'কে সে-রাত্তিরে কাছে পেলে খুশি হবেন তিনি। খোজা বার্তাবহ তা নিয়ে ছুটে যেত সে-ই রমণীর কাছে। চেয়ারে বসিয়ে তাকে বহন করে আনা হত সম্রাটের শোবার ঘরে। তুর্কী বেগমের মতই তাকেও হামা দিয়ে উঠতে হত পালঙ্কে। দু'জন সশস্ত্র খোজা সারারাত দরজা আগলাত। ভোরে খোজাদের প্রধান মস্ত একটা বাঁধানো খাতা নিয়ে হাজির হত সম্রাটের সামনে। তাতে মেয়েটির নামের পাশে লিখে রাখা হত সম্রাটের মন্তব্য। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কোন্ রানীর কোন্ সন্তান বৈধ, কোন্‌টি অবৈধ সহজেই তা চিহ্নিত করতে পারবে রাজ্যের শুভার্থীরা, সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন সম্রাট নিজেও। আপন হাতে খাতায় সই করতে হত তাঁকে।

তুর্কী হারেমে এসব রীতি ছিল কিনা ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। তবে অনুষ্ঠানের শেষটুকু অন্যদিক থেকে দেখলে প্রায় এক রকম।

নিজের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে এক করে ওই দুরূহ রাত্রিটির সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল মেয়েটি। যাবতীয় ছলা-কলা উজাড় করে

দিয়েছিল। কেননা, সে জানত আজ রাত্রেই স্থির হবে তার ভাগ্য। আজ যদি সে মোহিনী না হতে পারল, এত কাছে পেয়েও হৃদয়-পিঞ্জরে বন্দী না করতে পারল মানুষটিকে, কাল তবে আবার সে ভিখারিণী।

দিনের আলো ফোটার আগেই দুয়ারের খোজা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল, ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল রাত শেষ হতে আর বিশেষ বাকি নেই, স্বপ্নলোক থেকে এবার নিজের মহলে ফিরতে হবে রাত্রি-সহচরীকে। জাগতে হল বাদশাহকেও। রাত্রে তিনি যে পোশাকে ছিলেন এখন তার মালিক রাতের সঙ্গিনী। সে অমূল্যধন বয়ে নিয়ে ভাগ্যবতী চলল নিজের ঘরে। এবারও দুরু দুরু বুক। সকালে হয়ত আনন্দিত সুলতানের তৃপ্তির খবর নিয়ে আসবে উপহারের ডালি; নতুন এক প্রস্ত পোশাক, একটি হীরের মালা, এক মুঠি মোহর। খুশির হাওয়া বইবে হারেমের একটি ঘরে।—আর, যদি তা না আসে? সে কথা ভাবতেও ক্ষণে ক্ষণে শিউরে ওঠে মেয়েটি। সত্য, অঙ্গে উত্তাপ ছিল, গলায় আবেগ ছিল, মুখে ছিল—হাসি। কিন্তু কে জানে, সবই হয়ত অভ্যাসবশত। এমনও তো হতে পারে, মনে মনে তাকে খারিজ করে বসে আছেন তিনি,—তখন?

বাদশাহের বুকের ওপর নাকি অদৃশ্য এক মিহি সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা আছে একটি খোলা তলোয়ার, সোহাগীর ভাগ্য আন্দোলিত তার চেয়েও অনিশ্চিত অস্থির একটি দোলায়। এই স্বর্গ, এই নরক; শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে স্থির হবে এই হিন্দোল কেউ জানে না। আজ বেগম, কাল বাঁদী—সবই এখানে সম্ভব। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে এই রোশনাই। হাতে তখন হয়ত প্রদীপটিও থাকবে না।

শুধু এটুকুই নয়, আরও অনেক কিছুই শোনা ছিল। সুতরাং, প্রস্তাব শুনে চমকে উঠলেন কনস্টানটিনোপল-এ মোতায়েন ব্রিটিশ রাজদূত।—মক্কার আমীরকে বিয়ে করতে চান আপনি? শেরিফ আলি হাইদরকে?—আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন মিস ডান?

সামনেই বসেছিল মেয়েটি। বিশিষ্ট ইংরাজ কর্ণেলের একমাত্র কন্যা। গোলাপের মত রং, এক মাথা চুল, নীল দুটি চোখ। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি।

প্রবীণ রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকাতে গিয়ে মেয়েটি লজ্জায় মাথা নোয়াল।

—আপনি কি জানেন, এই লোকটিকে বিয়ে করা মানে চিরকালের মত ইংরাজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া,—সভ্য দুনিয়া থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেওয়া!

মৃদু হাসল মেয়েটি। হেসে আবার মাথা নোয়াল।

—আপনি কি জানেন, এর পর সারা জীবন কাটাতে হবে আপনাকে অন্তঃপুরে, আর সে অন্তঃপুরেরই নাম হারেম! শেষবারের মত নিজের দেশের নির্বোধ মেয়েটিকে বাঁচাতে চাইলেন কর্তব্যপরায়ণ রাজদূত।

কিন্তু ইসাবেলা ডান এবারও হাসল।

—দেন আই মাস্ট উইশ ইউ দি বেস্ট অব লাক অ্যাণ্ড এভরি হ্যাপিনেস, মিস ডান! পরাজিত রাজদূত হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্য। সহানুভূতি দেখাতেই বোধহয়, দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মেয়েটিকে। যতক্ষণ ওকে দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ ওর পথের দিকেই তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর নিঃশব্দে ফিরে এলেন নিজের আসনে। কিন্তু তখনও তাঁর মাথায় নির্বোধ ইংরাজ তরুণীটি ঠায় বসে আছে। কিছুতেই ওকে বিদায় করতে পারছেন না তিনি।

এত ভাববার সময় নেই ইসাবেলার। সব বিধি-ব্যবস্থা শেষ হয়ে আছে। এক্ষুনি ছুটতে হবে বিয়ের আসরে। অন্য কথা ভাববার ফুরসত কোথায় তার? ইসাবেলা সোজা চলল প্রাসাদের দিকে।

এক ঘণ্টার মধ্যে শুভকর্ম নিষ্পন্ন। জনৈক ব্রিটিশ কর্ণেলের একমাত্র কন্যা ইসাবেলা ডান-এর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল পয়গম্বরের উত্তরপুরুষ, মক্কার তরুণ আমীর শেরিফ আলি হাইদরের। সপ্তদশী ইংরাজ-তনয়ার নতুন নামকরণ হল। ইসাবেলা এখন বিবি ফাতিমা। তিনি হারেমবাসিনী। চারদিকে দেওয়াল ঘেরা, গম্বুজ আর মিনার-শোভিত একটি প্রাসাদ তার ঠিকানা।

খবর শুনে তামাম ইউরোপ বিস্ময়ে হতবাক্। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা; দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, মনে মনে বিষাদের ছায়া। পশ্চিমের স্বাধীন মেয়ে পুবের হারেমে চলে গেল, এবং চলে গেল স্বেচ্ছায়, এ খবর মন বিশ্বাস করতে চায় না—এমন ঘটনা কি কখনও সম্ভব?

পরে জানা গিয়েছিল এই উদ্বেগ অহেতুক। সুখী হয়েছিল ইসাবেলা। প্রাচ্য রমণীর মত সুখী নয়, পশ্চিমের মেয়েরা যা চায় কার্যতঃ তার সবই পেয়েছিল। পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছিল, জাগতিক কোন সুখই তার নাগালের বাইরে ছিল না। সাক্ষী দিয়েছেন আর

কেউ নয়, ইসাবেল্লার নিজের কন্যা শাহজাদী মুসবা হাইদর। ক'বছর আগে (১৯৫৯) মায়ের দেশ বেড়াতে এসে সানন্দে জানিয়ে গেছেন তিনি,—মা আমার সুখী ছিলেন। হারেম সম্পর্কে তোমরা যা শুনে আসছ সবই তা ভুল, ভুল।

হয়ত।

হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রিতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন সম্রাট। সম্রাট শাজাহান। পর পর চারজন বাঁদীর ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। ঘরে ঢুকে সম্রাট প্রশ্ন করলেন—বলতে পার ভোর হতে কত দেরী? মেয়েটি চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল—দেরী আছে জাঁহাপনা, আমার মুখে যে এখনো পানের স্বাদ লেগে আছে। দ্বিতীয় জনও একই উত্তর দিল।—কী করে বুঝলে? প্রশ্ন করলেন সম্রাট। মেয়েটি আঙ্গুল দিয়ে ঘরের মোমবাতিটি দেখালো,—ভোরে কখনও এমন উজ্জ্বল দেখায় না মোমের আলো। তৃতীয় মেয়েটি বুঝিয়ে বলল—ভোর হলে আমার হাতের বালায় বসানো মুক্তোগুলো ঠাণ্ডা লাগত, হাত দিয়ে দেখুন, মুক্তো এখনও শীতল হয়নি। চতুর্থ মেয়েটি কাশ্মীরী। ওরা নাকি চিরকাল ঠোঁটকাটা। বলল—ভোর হলে আমার স্নানের ঘরে যেতে ইচ্ছে করত—কই, তেমন তো কিছু মনে হচ্ছে না।

চারজনের উত্তরেই সম্রাট তুষ্ট। পরদিন বাদশাহ হুকুম দিলেন—নতুন পদে বহাল করা হল এই চার বাঁদীকে। একজন হবে তাম্বুল বিভাগের অধিকর্ত্রী, দ্বিতীয়—আলো বিভাগের, তৃতীয়—গহনা বিভাগের, চতুর্থ—স্নানঘরের। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে সিঁড়ি সেখানেই শেষ হয়ে যাবে না হয়ত। হারেম স্বর্গ। সত্যই সেখানে কোন সুখই নাগালের বাইরে নয়।

হারেম স্বর্গ। সুখের স্বর্গ। দেশে দুর্ভিক্ষ হত, কিন্তু হারেমে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র অভাব ঘটত না কোনদিন। তুর্কী হারেমে বড় বড় রসুইখানা ছিল দশখানা। তারপরও অসংখ্য মাঝারি ও ছোট

রান্নাঘর। বিশাল রসুইখানাগুলোতে সু-শিক্ষিত, সু-অভিজ্ঞ পাচক ছিল দেড়শ'। তাছাড়া জল, জ্বালানি, মশলা, বরফ ইত্যাদি জুগিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল অসংখ্য ভৃত্য। প্রধান পাচকের নাম—'আস্‌জি বাসি'। তার অধীনে ছিল পঞ্চাশজন সহকারী। মিঠাই কারিগরদের প্রধানের পদবী ছিল—'হেল্‌বাজি বাসি'। তার সহকারী ছিল তিরিশ জন। প্রধান খাদ্য-পরীক্ষকের পদবী—'চাস্‌নিজি বাসি'। তার অধীনে খাদ্য চেখে দেখবার জন্য আছে আরও একশ'জন। জ্বালানির দায়িত্ব একশ' 'আজিম ওগলানের' ওপর। প্রতিদিন দু'শ গাড়ি জ্বালানি লাগত হারেমের উনুনগুলোর জন্য।

সবচেয়ে বেশি যত্ন, বেশি সতর্কতা স্বভাবতঃই সুলতানের খাদ্য সম্পর্কে। অন্যান্য খাদ্য তো আছেই, তাঁর জন্য মিশর থেকে আসত খেজুর, রুমানিয়া হাঙ্গেরি থেকে আসত মধু, তেল আসত কানড়িয়া থেকে, মাখন—কৃষ্ণসাগরের ওপারে মলডেভিয়া থেকে। সুলতানের রসুইখানাটি আর সকলের রসুইখানার থেকে স্বতন্ত্র। স্বয়ং 'আস্‌জি বাসি' রান্না করেন তাঁর জন্য। খাদ্যে যাতে ধোঁয়ার গন্ধ না লাগতে পারে সেজন্য অন্য ধরনের উনুনে রান্না। রান্নার অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পরেই বিশেষ পাত্রে বরে সে খাদ্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হত প্রাসাদে। বাকি রান্নার কাজটুকু সেখানেই হবে। সবশেষে, সুলতান খাওয়ার টেবিলে বসার আগে খাদ্যে মেশানো হবে বিশেষ বিশেষ মসলা। খুশবু এবং স্বাদ যাতে ঠিক থাকে তা-ই এসব নিয়ম।

সুলতান একা খেতেন না। খেত বেগম বাঁদীরাও। যার যা ইচ্ছে তা-ই খেত। হারেমে খাদ্যাভাব নেই। দেশে লক্ষ লক্ষ প্রজা হয়ত নিরন্ন। কিন্তু হারেমে প্রাচুর্য। অঢেল খাদ্য এখানে,—যদৃচ্ছ। অপচয়ও যথেষ্ট। তা হোক। হারেম সাধারণ গৃহস্থের ঘর নয়, সুলতানের আপন অন্দর। স্তূপীকৃত মাংস সংগ্রহ বরে রাখা হত এখানে শরৎকালে। ইঙ্গিত মাত্র বসফরাসের জলে শত ডিঙ্গি ভাসত মাছ ধরার জন্য। তারপরও তুরস্কের সুলতানের দৈনিক ফর্দে ছিল :

কচি ভেড়া—২০০

ভেড়া—১০০

বাছুর—৪

রাজহাঁস—৪ জোড়া

মোরগ—১০০ জোড়া

মুরগী—১০০ জোড়া

পায়রা—১০০ জোড়া

এছাড়া ছিল পোলাও, মিঠাই, সরবৎ, বরফ। হারেমে সুখ ছিল বই কি। সোনার দণ্ডে স্থাপিত চীনে-মাটির পাত্রে খাদ্য সরবরাহ করা হত মুঘল হারেমে। বাদশাহের মত বেগমরাও খেতেন সোনার পাত্রে। মুঘল হারেমে রান্নাঘর চালু রাখতে দৈনিক খরচ হাজার টাকা।

কেবল খাদ্য নয়, খাদ্য আর পানীয়ের মতই অন্য আয়োজনও। সর্বাঙ্গে গহনা, কত কী নাম তার।—ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে মুক্তোবসানো আংটিটিতে ছোট্ট একটি আয়না। গরবিনী বেগম থেকে থেকেই সেদিকে তাকায়, এত রূপ ছিল তার, এখানে না এলে কোন দিনই সে-খবর তার জানা হত না।

আতর-গন্ধে আমোদিত মহল। মেহেদি রঞ্জিত লঘু দুটি পা ফেলে তারই মধ্যে যেন পরীর মত উড়ে যাচ্ছে সোনার বরণ কন্যা। চোখে সুরমা, মুখে ওড়না। ওরা বলত—লাচক। হাওয়া বুনে তৈরী হয়েছে যেন তার বসন। দুই তিন প্রস্ত পোশাক, কোনটিরই ওজন নাকি এক আউন্সের বেশি নয়। এক একটার দাম সেকালেও চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু বেগমরা কেউ নাকি তা এক রাত্তিরের বেশি পরে না, একই পোশাকে দ্বিতীয় বার সুলতান বাদশাহের সামনে আসতে মানা।

সাজসজ্জার বহর বোঝা যাবে প্রাসাদের কারখানাগুলোর দিকে তাকালে। তুরস্কের সুলতানের প্রাসাদে নানা ধরনের কারিগর

ছিল ৫৮০ জন। তাদের মধ্যে স্বর্ণকার—৫৮ জন, এনগ্রেভার—৯ জন, গহনায় পাথর বসাত—৫ জন, রুপোর তার বানাত—৪ জন। এছাড়াও দরজি ছিল ১৬ জন, চার জন নিপুণ তাঁতী রেশম বুনত।

তুর্কী সুন্দরীর পোশাকে কিঞ্চিৎ জটিলতা ছিল। মাত্র দু'তিন প্রস্তে খুশি থাকত না নাকি ওরা। নানা ধরনের পোশাক ওদের। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি : (ক) 'গোমলেক', বা পশম আর সুতী মিশিয়ে তৈরী সেমিজ। কোমর অবধি খোলা থাকত সেটা, বুক দেখা যেত। ক্রমে সংস্কার করা হল। গলার কাছে হীরের পিন্ বসল,—নীচের দিকেও বোতামের বদলে ব্যবহার শুরু হল জড়োয়া বন্ধনীর। (খ) 'দিজলিক', নিম্নাঙ্গের আবরণ এটি। এক ধরনের পাজামা বলা যায় একে, এটিই নাকি শালোয়ারের আদি। (গ) 'শালোয়ার' একটু অন্য ধরনের পাজামা। (ঘ) 'ইলেক'—ওয়েস্টকোট। আঁটোসাটো করে মেয়েরা পরত সেটি কোন কোন মরশুমে। (ঙ) 'এন্ত্রাই'—গাউন। এই বিশেষ ধরনের গাউনের পেছনের দিকটা এঁটে বসত পিঠে। অনেকে বলেন তুর্কী মেয়েরা বক্ষাবরণী ব্যবহার করত না, তার কাজ চালাত এই 'এন্ত্রাই' আর 'ইলেক'। (চ) 'কুসাক', এটি নিম্নাঙ্গের শাল। মেয়েরা হালকা ভাবে কোমরে জড়িয়ে রাখত। বাঁদীরা এটি ব্যবহার করত কার্যতঃ কোমর-বন্ধ হিসাবে। এর ভাঁজেই লুকিয়ে রাখত পয়সা, চিঠিপত্র কিংবা ছুরি। এর পরও টুকিটাকি পোশাক আছে আরও অনেক। যথা—'ইয়াসমাক' বা ঘোমটা। মসলিনের দুটি টুকরো। প্রথম টুকরোটি চোখ ঢাকত না, নাকের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে পিছনে বেঁধে দেওয়া হত, নেমে আসত বুক অবধি। দ্বিতীয় টুকরোটি জড়ানো হত মাথায়, সেটিও ভুরু বরাবর এসেই থেমে যেত। দুই ইয়াসমাকের মাঝখানে জেগে থাকত দুটি আয়ত চোখ। তাতে কি কেবলই অতৃপ্ত কামনার কথা? সে চোখে শান্তিও ছিল নিশ্চয়। তৃপ্তি ছিল।

সুখের শেষ নেই হারেমে। বাইরের পৃথিবীতে পনের আনা

মানুষের ঠিকানা কুটির। ওরা প্রাসাদবাসিনী। ওদের জন্য তৈরি হয়েছে ক্রীড়াকক্ষ,—'ভুল-ভুলাইয়া', শিশমহল। ওদের জন্যেই এইসব ফোয়ারা, বাগান, হ্রদ, বেমারখানা ; ওদের মনোরঞ্জনের জন্যই ব্যস্ত সুলতান বাদশাহের দিনপঞ্জীতে ঠাঁই পেয়েছে রাশি রাশি উৎসব—নওরোজ, খুশরোজ, মীনাবাজার।

মীনাবাজার বসত মুঘল প্রাসাদ-অঙ্গনে, নওরোজ উপলক্ষে। আটদিন ধরে চলত সে অভিনব খেলা। আকবর প্রবর্তন করেছিলেন উপভোগ্য এই কৌতুকের। শাজাহানের আমলেও জমজমাট সে রূপের হাট। একমাত্র রূপসী নারীরই প্রবেশাধিকার ছিল সেখানে, আর কারও নয়। সমগ্র হারেম ভেঙে পড়ত এই মেলায়। বেগম বাঁদীরা নিজেরা পসরা নিয়ে বসত। দোকান সাজিয়ে অপেক্ষা করত বাইরের সুন্দরীরাও।

হারেমের মতই এখানেও একমাত্র পুরুষ বাদশাহ। তাতার রমণীর দল আসনে বসিয়ে তাঁকে বয়ে নিয়ে আসত মেলা প্রাঙ্গণে। চার পাশে ঘিরে থাকত প্রহরিণীর দল। কেনাকাটার ছলে আপন বাসনার ইঙ্গিত দিতেন বাদশাহ। সে রাত্তিরেই হয়ত সুরূপা দোকানীর নামে আমন্ত্রণ আসবে বাদশাহের শয়নকক্ষ থেকে। কেউ হয়ত আচলে মোহর বেঁধে পরদিন ভোরেই বেরিয়ে যাবে প্রাসাদ ছেড়ে, ভাগ্যবতীরা স্থায়িভাবে থেকে যাবে হারেমেই। নন্দনলোকে প্রতিযোগিতা বাড়বে।

তাতে কিছু আসে যায় না। জীবন কোথায় প্রতিযোগিতাশূন্য ? সুতরাং, মিছিমিছি ওসব ভেবে মন খারাপ করার অর্থ হয় না। তার চেয়ে ঢের ভাল মীনাবাজারের এই উদ্দাম হাসিতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। তিরিশ হাজার রমণী সমবেত এখানে। তিরিশ হাজার মানবীর কাকলি। নিশ্চয় দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে আফসোস করছে লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত। এ মেলায় যোগ দেওয়া, আর এভাবে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা—সে কি কম গর্বের কথা। তাই যদি না

হবে তবে মীনাবাজারে হাজির থাকার জন্য কেন রাজধানীর রূপসীদের মনে এই ব্যাকুলতা?

মীনাবাজারের বদলে তুর্কী হারেমে ছিল—টিউলিপ উৎসব। ফুলের উৎসব। প্রতি বছর এপ্রিলে ফুলের মেলা বসত প্রাসাদ-অঙ্গনে। মেয়েরা আপন হাতে সুলতানের জন্য উপহার তৈরি করত বছর ভর, উৎসব-দিনে ডালি হাতে হাজির হত প্রাঙ্গণে। আলোয় আলোয় রাত সেখানে দিনের মত। মেলা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে সুলতানের পর্যবেক্ষণ মঞ্চ। যার যা আবিষ্কার, উদ্ভাবন, উপহার, সব সাজানো হয়েছে সেখানে। সুলতানকে খুশি করার জন্য সকলেই যোগ দিয়েছে প্রতিযোগিতায়। সব আয়োজন যখন শেষ তখন এসে হাজির হতেন সুলতান। সংগোপনে আসতেন তিনি। তাঁর উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র চারদিক থেকে মেয়েরা ছুটে এসে ঘিরে ধরত তাঁকে। যেন ফুলের সন্ধান পেয়েছে মৌমাছির ঝাঁক—লিখেছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যেকেই আর সবাইকে ছাপিয়ে সুলতানের নজরে পড়তে চায়। সকলেই সুলতানের মুখে তার বুদ্ধির তারিফ শুনতে চায়। না দেখলে বিশ্বাস হয় না, পুরুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার কত কৌশলই না জানে ওরা!

প্রদর্শনী পর্ব শেষে শুরু হয় নৃত্যগীত, কথকতা, প্রহসন ইত্যাদি। পুরোপুরি মেয়েদের অনুষ্ঠান। একমাত্র দর্শক সুলতান। একটি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন তিনি। পাশে আর একটি আসন। সেটি শূন্য। চোখ তাঁর নেচে বেড়াচ্ছে মুখ থেকে মুখে। হঠাৎ তালি বাজাতে দেখা গেল তাঁকে। অনুচ্চ, অর্থপূর্ণ তালি। নিমেষে 'কিস্‌লার আগা' হাজির হল তাঁর সামনে। সুলতান তার কানে কানে কী যেন বললেন। তারপর হাতের রেশমী রুমালটি তুলে দিলেন তার হাতে। কিছুক্ষণ পরেই পিছনের দরজা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বিজয়িনী। আজকের মত নায়িকা সে, শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তার হাতে। অভিবাদন করে মেয়েটি সুলতানের পাশের আসনে

বসে পড়ল। তার আগেই পর্দায় ঢেকে দেওয়া হয়েছে সুলতানের আসন। চিকের আড়ালে শূন্য আসনে কে বসল তা ভেবে অন্যরা হয়রান। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাকা খবরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে। অবশ্য আড়াল-আবডাল থেকে যারা সব দেখেছে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র আবার সরে যাবে পর্দা। সম্রাটের পাশে দেখা যাবে মনোনীত টিউলিপটিকে। একজন করে যুগল-মূর্তির সামনে দিয়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে নিজেদের কক্ষে ফিরে যাবে অভিনেত্রীরা। সুলতান প্রত্যেকের হাতে তুলে দেবেন আজ কিছু না কিছু উপহার। সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর আসন ছেড়ে উঠবেন সুলতান। হাত ধরে তুলবেন রাত্রির নায়িকাকে। তার আজ ছুটি নেই।

মীনাবাজার, খুশরোজ, কিংবা টিউলিপ-উৎসব একমাত্র আমোদ নয়। মাঝে মাঝে অন্য ধরনের প্রমোদ-আসরও বসত হারেমে। কক্ষে কক্ষে সেদিনও সমান চাঞ্চল্য, দেওয়ালের আড়ালে একই উদ্দামতা। কখনও বা উঁকি দেওয়ার সুযোগ আসত বাইরেও। শুধু শ্মশানে সহমরণে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও নয়,—প্রমোদ-যাত্রারও সৌভাগ্য আসত জীবনে। গ্রীষ্মে প্রমোদ-তরীতে হারেম সাজিয়ে বসফরাসে ভাসতেন তুরস্কের সুলতান। দূরে আরও একাধিক প্রাসাদ ছিল তাঁর। কখনও বা অবসর যাপন করতে সঙ্গিনীদের নিয়ে যাত্রা করতেন তিনি তারই কোন একটির দিকে। দর্শনীয় সে শোভাযাত্রা। মুঘল বাদশাহরা গ্রীষ্মে যাত্রা করতেন কাশ্মীর। আউরঙ্গজেবের হারেম-সহ এই কাশ্মীর যাত্রার সুন্দর একটি বিবরণ রেখে গেছেন বার্নিয়ার :

কেউ কেউ বাদশার মতই বসে আছে দোলায়। খোজারা বয়ে নিয়ে চলেছে তাদের। দোলাগুলো অপূর্ব। রঙীন, গিল্টি-করা এবং নানারঙের রেশম জালে ঘেরা। পর্দার তলার দিকে নক্সাকাটা ঝালর।

এই নারী বাহিনীর আগে আগে রোশন আরা। হারেমে তিনিই তখন সবচেয়ে সম্মানিত মহিলা। তিনি বসে আছেন হাতির পিঠে, মনোহর হাওদার নীচে। তাঁর পিছনে আরও পাঁচ ছয়টি হাতি। তাদের পিঠে বাদশাজাদীর প্রিয় খোজা, বাঁদী এবং সহচরীর দল। দুই ধারে ঘোড়ার পিঠে চলেছে খোজা, তাতার এবং কাশ্মীরী প্রহরীদল। প্রত্যেকের অঙ্গে বর্ণাঢ্য পোশাক।···

বেগম সাহেবার বাহিনীর পরে হারেমের অন্য মান্য মহিলারা এবং তাঁদের দলবল। প্রত্যেকের সঙ্গে চলেছে তাঁর মর্যাদার মাপ অনুযায়ী গোলাম, বাঁদী, পরিচারিকা, প্রতিহারিণী। একে একে পনের ষোল জন চলে গেলেন সামনে দিয়ে। দীর্ঘ মিছিল। শোভাযাত্রায় হাতিই আছে কমপক্ষে পঞ্চাশটি। এমন জমকালো দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি—লিখেছেন বার্নিয়ার।

দর্শক কি তিনি একাই? উদ্ধত প্রহরীরা কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। স্থানীয় লোকেরা যথাসাধ্য দূরে দূরে থাকত চলমান হারেমের যাত্রাপথ থেকে। কেননা, উঁকিঝুঁকি দিলে গর্দান যাওয়ার সম্ভাবনা। বার্নিয়ার নিজেও নাকি বিপাকে পড়েছিলেন কাছাকাছি থেকে রূপের এই শোভাযাত্রা দেখতে গিয়ে। ভাগ্যিস, তেজী ঘোড়ার পিঠে ছিলেন তিনি, তা-ই প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছিলেন! তিনি লিখেছেন—পারস্যে হলে এভাবে ছাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না আমার। সেখানে পর্দা আরও ভারি, রীতিনীতিতেও বড্ড কড়াকড়ি; হারেম থেকে আধ লীগ দূরে কাউকে দেখা গেলেও ধরে এনে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত তাকে। হারেম প্রমোদ-যাত্রা শুরু করার আগেই পারসিক সুলতানের নির্দেশে যাত্রাপথ দর্শকশূন্য করা হত। গ্রামের লোকেদের গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিতে হত অন্যত্র। তারই মধ্যে 'পিপিংটম' কিছু কিছু থেকে যেত নিশ্চয়। তারা নিরাপদ আড়াল থেকে দু'চোখ ভরে বেগম বাঁদীদের রূপসুধা পান করত। আকণ্ঠ রূপ

আর রঙ পান করতেন বেগমের দলও। দেখবার বস্তু কি শুধু পুরুষই ? এই নীল আকাশ, বন পাহাড়, নদী নালা, ফসলের ক্ষেত, পাখির ঝাঁক—চার দেওয়ালের বন্ধনীতে জীবন কাটে যাদের, তাদের কাছে উপভোগ্য সবই। ঘোড়সওয়ার ফিরিঙ্গীর এই যে পলায়ন, তাও নিশ্চয় হাসতে হাসতে উপভোগ করেছে হাওদার ছায়ায় বসা সুন্দরীর দল !

আরাম ছিল হারেমের জীবনে। আমোদ ছিল। ফর্দ এখনও ফুরোয়নি। নানা ধরনের ক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল সেই অন্তঃপুরে। শুধু দাবাখেলা, তাস-পাশা আর পাঁচাশী নয়, মুঘল হারেমে মেয়েরা পোলো অবধি খেলত। বাইরের পৃথিবীতে জীবনের পথ বড়ই রুক্ষ, সেখানে শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। হারেমে অফুরন্ত অবসর। দেওয়ালের ওপারে বিশ্বময় অশিক্ষার অন্ধকার। হারেমে কিন্তু অশিক্ষিতের ঠাঁই নেই। শুধু পেশাগত বিদ্যা নয়, নির্দিষ্ট সময় রীতিমত ছাত্রী-জীবন কাটাতে হত সেখানে নবাগত প্রতিটি মেয়েকে।

'সুলতানা ভালিদ'-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদ্যালয় ছিল। মেয়েরা সেখানে অন্যান্য বিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখত। চিকিৎসক, ধাত্রী, হিসাব রক্ষক, পত্র লেখিকা ওরাই। হুমায়ুন-কন্যা গুলবদন লেখিকা ছিলেন। বিদুষী ছিলেন শাজাহানের দুই কন্যা—জাহানারা আর রোশন আরা। কিন্তু সাধারণ বেগম বাঁদীরাও কেউ পুরোপুরি অশিক্ষিত ছিল না। 'ওয়াকিয়া নবিশ' আর 'খুকিয়া নবিশে'র দল রাজ্যের দিনের খবর পেশ করত বাদশাহ বরাবরে, পত্রাকারে। প্রতি রাত্রে ন'টার সময় বাঁদীরাই নাকি সে-সব সংবাদপত্র পড়ে শোনাত বাদশাহকে। বেগমরা পড়তেন কোরাণ। অন্য সময় গুলিস্তান, বোস্তান, কিংবা অন্য কোন প্রেমোপাখ্যান। বাঁদীরা মুখে মুখে কিস্‌সা বলত ওদের কাছে। তত্ত্ব কথা কম, নিছক হাসির গল্প কিংবা প্রণয়-কাহিনী। দুঃখকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইত ওরা। সুলতান দূরে সরিয়ে রাখতে

চাইত ব্যাধিকেও। বাইরের দুনিয়ায় বিনা চিকিৎসায় মারা যেত লক্ষ লক্ষ মানুষ। কালের সেরা দাওয়াই মজুত থাকত হারেমের হাসপাতালে। বিদেশিনী চিকিৎসক মোতায়েন করেছিলেন আকবর তাঁর হারেমে। হারেমে বিনা চিকিৎসায় মরে না কেউ। অসুস্থ হলেই বেমারখানা। অসুস্থ শয্যাসঙ্গিনী দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকলে অবশ্য সুলতান কিংবা বাদশাহ প্রতিদিন দেখতে যেতেন না তাকে; বেমারখানা অতি না-পছন্দ তাঁর। তাতে দুঃখ করে লাভ নেই। মরার পর কারুকার্যখচিত স্মৃতি-সৌধ, শ্বেতপাথরের বিস্ময় তাজমহল—সেও কি তুচ্ছ প্রাপ্তি?

অতএব অনেকেই সায় দেবে শ্রীমতী মুসা হাইদরের কথায়, মিথ্যা বলেননি তিনি। হারেম সম্পর্কে আমরা যা জানি অনেকখানিই তার—ভুল, ভুল, ভুল।

কাল—এই শতক। স্থান—সৌদি আরবের শেখের প্রাসাদ নয়, মরক্কোর সুলতানের হারেমও নয়; মক্কার আমীরের প্রাসাদ। মুসা হাইদরের বিবরণ অনুযায়ী মেয়ে-পুরুষে মিলিয়ে সাকুল্যে সেখানে মাত্র ষাট জন মানুষের বাস। সুতরাং মুসা হাইদর হয়ত অসত্য বলেননি, সত্যই হয়ত সুখী হয়েছিলেন তাঁর জননী—ইসাবেলা ডান। কিন্তু ইতিহাস বলবে—তাঁর জবানবন্দীই হারেমের একমাত্র কাহিনী নয়। খলিফা আলমুতাওয়াক্কিলের প্রাসাদে রূপসী ছিল চার হাজার, মহম্মদ তুঘলকের সৌখিন পৌত্র মকবুলের ছিল দু'হাজার। এমন যে মহানুভব বাদশাহ আকবর, আবুল ফজল বলে গেছেন, তাঁর হারেমে বাঁদী বেগম মিলিয়ে ছিল পাঁচ হাজার নারী। জাহাঙ্গীর আরও বিলাসী সম্রাট, হারেম বাবদে দৈনিক খরচ তাঁর নাকি তিরিশ হাজার টাকা। শাজাহান বিশ্বখ্যাত বিলাসী। তাঁর কাহিনী ক্রমশ প্রকাশ্য। আউরঙ্গজেব তত ভোগী ছিলেন না নাকি, ম্যানুসি বলেন, তাঁর হারেমে বিবি বাঁদী ছিল দু'হাজার। আর তুর্কী হারেম? অত্যন্ত ব্যস্ত, বিব্রত এবং ক্লান্ত যে সুলতান তুরস্কের, তাঁর শয্যাসঙ্গিনীও কমপক্ষে তিনশ' জন। সত্যিকারের সৌখিনেরা তাতে তৃপ্ত হতেন না,—তাঁদের কারও কারও

হারেমে বিবির সংখ্যা—বারোশ'। সুতরাং, সব মক্কার আমীরের ঘর নয়, পরিস্থিতি অন্যত্র অন্য রকম হওয়াও সম্ভব।

কোথা থেকে আসত ওরা? আসত নানা পথে, দশ দিক থেকে। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মাৎস্যন্যায়,—সেদিনের পৃথিবী করুণাহীন, অস্থির। সেখানে পেটের জ্বালায় মা কোলের মেয়ে বেচে দেয়, দস্যু মোহরের লোভে মানুষ লুঠ করে, দরবারী চরেরা এখানে ওখানে ওত পাতে, জাল ফেলে শিকার ধরে। উপহার হিসাবেও আসত অনেকে। আবার কেউ কেউ আসত স্বেচ্ছায়।

লাহোরে, ইরাবতী তীরে আনারকলি বাজার। তার অদূরে ইরাবতীর বাঁ তীরে আট দেওয়ালে ঘেরা আশ্চর্য বিষণ্ণ স্মৃতিসৌধ। শ্বেতপাথরের গায়ে আরবী হরফে লেখা দুটো ছত্র—"আর একবার যদি প্রিয়তমার মুখটি দেখতে পেতাম, তাহলে হে আমার সৃষ্টিকর্তা, মৃত্যুদিন অবধি তোমার প্রশংসা করতাম আমি।" নীচে নায়কের নাম—"প্রেমকাতর সেলিম,—আকবর-তনয়।" সম্রাট আকবরের আদেশে জীবিত অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছিল মেয়েটিকে। বেচারা সম্রাটকে ফাঁকি দিয়ে ভালবেসেছিল নাকি যুবরাজ সেলিমকে। কেউ বলেন সে রূপসীর আসল নাম সরিফুন্নিসা। তিনি আফগান সুলতানদের ঘরের কন্যা। বাদশাহ আকবর একবার সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পুত্র সেলিম। সরিফুন্নিসার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি পাণিপ্রার্থী হলেন। বাদশাহ অমত করলেন না। সুলতানও সানন্দে সম্মতি দিলেন। কাবুলেই ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। সেলিম নববধূকে নিয়ে লাহোরে ফিরলেন। সরিফুন্নিসার যৌবন কবি করে তুলল তাঁকে। পত্নীর নাম দিলেন তিনি আনারকলি,—ডালিম কুঁড়ি। কিন্তু নূরজাহানের মত পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারল না সে কলি, অকালে ঝরে গেল সে। যুবরাজ অঝোরে কাঁদলেন, তারপর গড়ে তুললেন এই স্মৃতিসৌধ।

কেউ কেউ বলেন—কাহিনীটি সত্য, কিন্তু শাহজাদীর পরিচয়টি

নয়। তাঁরা বলেন—লাহোরে যে সুন্দরীর মরদেহ ধারণ করছে এই আশ্চর্য সৌধ, তিনি আফগান দেশের কন্যা নন। তাঁর নাম—সাহিব-ই-জামাল। তিনি আগ্রারই কোন অমাত্যদুহিতা। শাহজাদা সেলিমের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল মেয়েটি কোন মীনাবাজারে। সে আনন্দমেলা সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিলেন তিনি শাহজাদীর পিতার কাছে। ওমরাহ হয়ে বাদশাহ-তনয়ের প্রার্থনাকে নাকচ করে দেওয়ার স্পর্ধা ছিল না তাঁর; কিন্তু জানা ছিল, সম্রাটের সম্মতি আদায় সহজ হবে না। গোপনেই তাই মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন তিনি যুবরাজের হাতে। সেই তরুণীই শায়িত এই কবরের তলায়। নাম তার আনারকলি নয়,—মালকা-ই-অলিয়া—সাহিব-ই-জামাল।

কিন্তু সমসাময়িক দর্শক বিদেশী পর্যটক উইলিয়াম ফিঙ্ক বলেন—এসব কথা সত্য নয়। এই কবর যারা গড়েছিল সেই শ্রমিক দলের মুখেই আমি শুনেছিলাম মেয়েটির সত্য পরিচয়। আনারকলি ছিল আফগানিস্থানের গরীব ঘরের মেয়ে। নাম ছিল তার নাদিরা। সে আফগান প্রাসাদে সামান্য একজন ক্রীতদাসী ছিল। দরবারে নাচত। বেড়াতে এসে প্রৌঢ় আকবরের দৃষ্টিতে পড়ে গেল মেয়েটি। বাদশাহ তার নাচের তারিফ করলেন। রূপেরও। পাশেই বসেছিলেন আফগানিস্থানের শাসনকর্তা, নাদিরার প্রভু। হিন্দুস্থানের বাদশাহের মুগ্ধ, লুব্ধ চোখ দুটি তাঁর নজর এড়াল না। ফিরে আসার দিনে আকবর সবিস্ময়ে দেখলেন, সামন্তের উপঢৌকনের ডালিতে আরও অনেক বহুমূল্য উপহারের সঙ্গে রয়েছে একটি বাঁদী। সেই নর্তকী। দেশে ফিরে সম্রাট সোহাগ করে নাম রেখেছিলেন তার আনারকলি। বর্ষীয়ান বাদশাহের জীবনে এই নর্তকী একমাত্র বাসনা। সে নাচে, গায়, হিন্দুস্থানের বাদশাহের ক্লান্তি দূর হয়, রাজত্ব পরিচালনায় কখনও তাঁর উৎসাহের অভাব ঘটে না।

সেই শান্ত জীবনছন্দে হঠাৎ তাল ভঙ্গ হল। আনারকলির জীবনে আবির্ভূত হল দ্বিতীয় নায়ক। তিনি যুবরাজ সেলিম,

হিন্দুস্থানের পরবর্তী বাদশা। বাদশার কক্ষে নৃত্যসভা শেষে, ফেরার পথে পায়ের ঘুঙুর খুলে হাতে তুলে নেয় নর্তকী। তারপর নিঃশব্দে নেমে আসে মর্ত্যে, বাগানের নির্জন কোণটিতে। তরুপল্লব সেখানেই সবচেয়ে ঘন। কুঞ্জে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন যুবরাজ সেলিম। ক্রীতদাসী আর যুবরাজ সেখানে যেন আদিম মানব-মানবী।

ক্রমে জানাজানি হয়ে গেল সব কাহিনী। অবশেষে একদিন ছলনাময়ী ধরাও পড়ে গেল বাদশার কাছে। শিশমহলের দেওয়ালে স্পষ্ট দেখলেন আকবর—থেকে থেকে কামনার আগুন জ্বলে উঠছে ব্যভিচারিণী নর্তকীর চোখে। আবেগে মৃদু মৃদু কাঁপছে তার ঠোঁট। বাদশাহ প্রতিবিম্বিত আরও একটি মূর্তির দিকে তাকালেন। স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল সেলিমের মুখমণ্ডল,—আগুন তার চোখের কোণেও। সম্রাট যৌবনকে জানেন। তিনি জানেন এসব কিসের লক্ষণ!

তারপর আরও নানা ঘটনা। মহামতি আকবর ক্ষমা করতে পারেননি এই প্রতারিকাকে। হুকুম হয়েছিল—জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়া হোক ওকে! আট দেওয়ালের নিরন্ধ্র সৌধ গড়ে উঠেছিল একটি অসহায় তরুণীকে ঘিরে। উপহার হয়ে এসেছিল সে হিন্দুস্থানের হারেমে।

আনারকলি এসেছিল উপঢৌকন হিসাবে। অন্যভাবেও আসত কেউ কেউ। যথা—লক্ষ্ণৌর বেগম মুগাদ্দারি আউলিয়া। তার হারেমে আসার কাহিনীটিও শোনার মত।

বেগম আউলিয়া হিন্দুস্থানী নয়, ইংরেজ মেয়ে। আসল নাম ছিল তার মিস ওয়াল্টারস্। জর্জ হপকিনস্ ওয়াল্টারস্ নামে এক ইংরাজ সৈনিকের কন্যা সে। মা ছিলেন—লক্ষ্ণৌর জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ীর বিধবা। তিনিও জাতে ইংরেজ। একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সহ তিনি উঠে এসেছিলেন নতুন স্বামী ওয়াল্টারস্-এর ঘরে। আউলিয়া ওদের ছোট মেয়ে।

স্বামীর মৃত্যুর পর দুই মেয়েকে নিয়ে মিসেস ওয়াল্টারস্ আস্তানা পাতলেন কানপুরে। অভাবের সংসার। ভরসা একমাত্র দুটি মেয়ে। মেয়ে দুটি সুন্দরী। সুতরাং অনেকেই এগিয়ে এল সাহায্য করতে। সেই সূত্রেই ঘরে ঢুকল নিষ্ঠুর ঝড়ো হাওয়া ; পুরানো নৈতিকতার নিশানগুলো উড়ে গেল দিগ্বিদিকে। মিসেস ওয়াল্টারস্-এর দুহিতাদের ঘরে তখন গোটা কানপুরের অবাধ নিমন্ত্রণ। অন্ধকার এড়াতে পারলেন না মা নিজেও। জনৈক বকশ আলি নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিল তাঁকে। বকশ আলির বিচিত্র পরিচয়। একদা সে ছিল পরিচারক, তারপর—টাঙ্গাওয়ালা। তখন সাময়িকভাবে বাঈজীর দলে তবলা বাজাচ্ছে। তা হোক, মিসেস ওয়াল্টারস্-এর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, লোকটা তাঁকে ভালবাসে, তাঁর পরিবারের মঙ্গল চায়। ওরই পরামর্শ মত মেয়েদের নিয়ে তিনি একদিন যাত্রা করলেন লক্ষ্ণৌ।

কৌশলে বকশ আলি ফিরিঙ্গী তরুণী দুটিকে হাজির করল নবাবের সামনে। ব্যাপারী যেভাবে নিজের সওদা দেখায়, অনেকটা সেইভাবে। লক্ষ্ণৌর তক্তে তখন গদীয়ান নাসিরউদ্দীন। তিনি রুচিবান নবাব। বললেন—বড় মেয়েটিকে আমি চাই। বকশ আলি তা-ই চেয়েছিল। ১৮২৭ সনে ঘটা করে নাসিরউদ্দীনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মিস ওয়াল্টারস্-এর। নবাব নাম দিলেন তার মুগাদ্দারি আউলিয়া। নবাবকে সে ইংরাজী শেখায়, নবাব তাকে শেখাতে চান হিন্দুস্থানী। আউলিয়া হিন্দুস্থানীতেই জবাব দেয়—আমি তা জানি, এমন কি পারসিক ভাষাও জানি,—শুনবে? নাসিরউদ্দীন স্বভাবতঃই অতিশয় প্রীত এই বিবিকে পেয়ে। তিনি শুধু আউলিয়াকেই নয়, তার মাকেও সুখে রাখতে চাইলেন। নবাবের আদেশে মিসেস ওয়াল্টারস্-এর জন্য নতুন বাড়ি হল। তাঁর সংসারের যাবতীয় খরচ নবাবের। সে সংসারে, বলা নিষ্প্রয়োজন, বকশ আলিও আছে। তা থাকুক, শাশুড়ীর নৈতিক মান নিয়ে নবাব মোটেই ভাবিত নন।

তাঁর একমাত্র বক্তব্য—বকশ আলিকে বিয়ে করলেই তো সব গোল চুকে যায়।

১৮২৯ সালে নবাব শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা সুদে ইংরেজদের ষাট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার দিলেন। শর্ত: সুদের টাকাটা চারজন বেগমের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। তাদের একজন আউলিয়া বেগম। নবাবের নির্দেশ—শুধু আউলিয়া নয়, তার উত্তরাধিকারীদেরও অধিকার থাকবে এই অর্থে। সব ব্যবস্থা পাকা করে নাসিরউদ্দীন চোখ বুজলেন। সেটা ১৮৩৯ সনের কথা।

হারেম থেকে বেরিয়ে এলেন বেগম আউলিয়া। অনেক ধন-সম্পদ তাঁর সঙ্গে। স্থির করলেন মায়ের কাছাকাছি থাকবেন। কিন্তু সে বছরই মারা গেলেন মিসেস ওয়াল্টারস্। সুতরাং, আবার অন্ধকারে। এবার আর অভাবের তাড়নায় নয়, স্বভাববশতঃই বোধহয় নাসিরউদ্দীনের ভূতপূর্ব পত্নী আবার প্রমোদ-কন্যা। ঘোর যখন কাটল আউলিয়া তখন আবিষ্কার করলেন—বারো বছরের বিবাহিত জীবনে যা ঘটেনি,—ঘটলে ক্ষতি ছিল না, বরং লাভ ছিল অনেক,—এবার তা-ই ঘটতে চলেছে, তিনি মা হতে যাচ্ছেন। সে ওঁর কাছে অশোভন ঠেকল। সুতরাং, তলব হল হেকিমের। এবং চিকিৎসার জের হিসাবেই নাকি বিদায় নিলেন আউলিয়া। মাত্র আগের বছর তিনি বের হয়ে এসেছিলেন নাসিরউদ্দীনের হারেম থেকে।

তার পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। আউলিয়া কি একটা উইল রেখে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট তা নেড়েচেড়ে দেখে বললেন—জাল উইল। ওঁরা তাঁর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করলেন মৃত বেগমের বোন দ্বিতীয় ওয়াল্টারস্কে। তিনি তখন মায়ের প্রেমিক বকশ আলির প্রেমিকা। সুতরাং, বেগমের সব ঐশ্বর্যই অন্য পথে চলে এল বকশ আলির হাতে।

প্রশ্ন উঠবে—কে ঠেলে পাঠিয়েছিল মিস ওয়াল্টারস্কে

নাসিরউদ্দীনের হারেমে? দায়ী কি ওর মা, বকশ আলি,—না, সে নিজেই? সবই সম্ভব। শুধু দাসব্যবসায়ীদের পসরা হয়ে নয়, অনেকে এসেছিল নিজে নিজেই। এসেছিল কোন একজন মানুষের প্রতি আকর্ষণবশতঃ নয়, হারেম নামে একটি চুম্বকই টেনে এনেছে তাদের। গোলাম হোসেন কৃত 'সেইর মুতআকুয়েরিণ'-এ (Seir Mutaquerin) একটি হিন্দু তরুণীর উপাখ্যান আছে। সৈন্যরা ঘুম থেকে উঠে দেখল শিবিরের দুয়ারে সুরূপা একটি বালিকা ঘুমিয়ে আছে। অনাহারের ছাপ তার মুখে। ওরা তাকে জাগাল, যত্ন করে খেতে দিল। তারপর একজন প্রস্তাব দিল—যাবে আমাদের সঙ্গে? মেয়েটি হেসে বলল—অবশ্য। এমন সময় এসে হাজির ওর মা। বলল—কোথায় নিয়ে চলেছ তোমরা আমার মেয়েকে? ওরা বলল —আমরা নিয়ে যাচ্ছি কি? যাচ্ছে তোমার মেয়ে নিজেই। অনেক কান্নাকাটি করলেন জননী, মেয়েটিকে তবু ফেরানো গেল না।

শুধু ক্ষুধার্ত বালিকার কাছে নয়, উচ্চাভিলাষী বুদ্ধিমতীর কাছেও হারেম রহস্য। এখানে অন্নাভাব নেই, অতর্কিতে লুঠ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। হারেম এক আশ্চর্য স্বর্গলোক। এখানে অফুরন্ত বিলাস, অনন্ত সুযোগ।

অবশ্য অন্য কারণেও আসত কেউ কেউ। বার্নিয়ার লিখেছেন—হিন্দুস্থানের মুসলমানরা কাশ্মীরী মেয়েদের খুব পছন্দ করে। এর পিছনে অন্যতম মতলব নাকি ফরসা উত্তরপুরুষ সংগ্রহ। কাশ্মীরের সীমান্ত অঞ্চলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তার চেয়েও নাকি বেশি আগ্রহ মুঘল পুরুষের জন্য। ওরা দেহবর্ণ নিয়ে ভাবিত নয়,—ওরা চায় নিজেদের মধ্যে উচ্চবংশের রক্ত আমদানি করতে। বার্নিয়ার একজন মুঘল বড়মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নাকি তাঁকে বলেছেন—সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সেবার জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছি। যদৃচ্ছ ঘুরছি। এক জায়গায় উপজাতিরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। প্রত্যেকের সঙ্গে রূপবতী কন্যা।

—কী ব্যাপার? না, ওরা আপাতত মেয়েদের আমার শিবিরে রেখে যেতে চায়। কারণ ওরা নিজেদের ধমনীতে উচ্চবংশের রক্ত চায়। পরদিন অন্য আর একদল এসে হাজির। তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে নিজ নিজ স্ত্রীকে। ওরা বলল—তোমাকে যারা কন্যাদান করে গেছে তারা নির্বোধ। এসব মেয়ের অধিকাংশেরই হয় বিয়ে হয়ে গেছে, অথবা অচিরেই হবে। সুতরাং, এতে নিজের ঘরের কী উপকার? আমরা তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমাদের স্ত্রীদের।—হুজুর, প্রার্থনা পূরণ করতে হবে।

কারণ কখনও রাজনৈতিক, কখনও আর্থিক; আগন্তুক কখনও অসহায় বন্দী মাত্র, কখনও বা স্বেচ্ছায় অভিযাত্রিনী। কী পেত ওরা?

রোজেলানা সব পেয়েছিল। যা চেয়েছিল সব। রাশিয়ার কোন এক সাধারণ ঘরের মেয়ে সে। দাস-ব্যবসায়ীরা ধরে এনে বিক্রী করে দিয়েছিল কনস্টানটিনোপল-এর হাটে। সেখান থেকে হাত ফিরি হতে হতে একদিন এসে পৌছল সে সুলতান সুলেমানের হাতে। প্রথম দর্শনেই সুলেমান গোলাম হয়ে গেলেন ওর। পরম সমাদরে রোজেলানাকে ঠাঁই দিলেন তিনি প্রাসাদ থেকে দূরে, একটি সুলতানী প্রমোদভবনে। যদিও রক্ষিতা মাত্র, কিন্তু রোজেলানা কার্যতঃ সুলতানের দ্বিতীয় 'খাদিন'। সুলতান-জননী এবং এক নম্বর 'খাদিন' খাসমহলকে বাদ দিলে সে আর সকলের উপরে। হারেম এবং প্রজা মহলে তাকে নিয়ে নানা গুঞ্জন।

সেখানেই কিন্তু থামল না রোজেলানা। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সে আর্জি পেশ করল সুলতানের কাছে—সুলতান যদি সত্যিই ভালবাসতেন আমাকে তাহলে কি আর ফেলে রাখতেন দূরের এই বাগান-বাড়িতে! কথাটা প্রাণে লাগল সুলেমানের। ১৫৪১ সনের কথা। ক্রীতদাসীকে তিনি তুলে আনলেন আপন হারেমে। রোজেলানা এবার অনন্যা হতে চাইল। শুধু সুলতানের ভালবাসা নয়, সে ক্ষমতাও চায়। যদি অসম্ভব না হয়, তবে সে 'সুলতানা

ভালিদ' হবে একদিন। হারেমে সবাই জানে, ক্ষমতায় তার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা নেই।

অপেক্ষায় রইল রোজেলানা। অন্য নামও আছে একটা। সুলতান ওকে ডাকতেন—খুরেম। কিন্তু আর সকলে বলে—রোজেলানা। সবাই ক্ষণে ক্ষণে জানিয়ে দিতে চায়—তার পরিচয় জানতে কারও বাকি নেই। তাতে কিছু আসে যায় না। রোজেলানা দেখাবে সে নতুন পরিচয়ও অর্জন করতে জানে। সুলতানা ভালিদ একদিন শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। পথে অতঃপর কাঁটা রইল মাত্র দু'জন। একজন সুলেমানের প্রধানা বেগম বসফর সুলতানা, আর অন্য জন উজীর ইব্রাহিম। প্রথা অনুযায়ী বসফর সুলতানারই এবার 'সুলতানা ভালিদ' হওয়ার কথা, তাঁর পুত্রসন্তানও আছে একটি। তা থাক। নিপুণ হাতে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলল রুশ ক্রীতদাসী। সুলেমান যখন তার হাতে তখন কার সাধ্য তাকে ঠেকিয়ে রাখে। যথাসময়ে নির্বাসিত হলেন বসফর সুলতানা। একদিন দেখা গেল কে বা কারা খুন করে গেছে তাঁর পুত্রটিকেও। তারপর আরও অবিশ্বাস্য সংবাদ। বিনা অপরাধেই সুলতান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন আপন উজীরকে। কারও সন্দেহ রইল না সবই রুশ ক্রীতদাসীর কীর্তি।

তারপরেও নানা ঘটনা। সুলেমান আইন অনুযায়ী বিয়ে করলেন প্রিয় ক্রীতদাসীকে। পাকাপাকি আইনের বিয়ে। বিগত দুশ' বছরের মধ্যে কোন সুলতান এভাবে আনুষ্ঠানিক বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি। যা চাইত সবই পেত বেগমরা। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব তুলত না কেউ। রোজেলানা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল হারেমে। সে আর 'ইকবাল' বা সুলতানের শয্যাসঙ্গিনী মাত্র নয়, তাঁর বিবাহিত পত্নী। বিবাহিত পত্নীর মর্যাদা পেত সাধারণ 'খাদিন'রাও। কিন্তু রোজেলানার সম্মান অন্য ধরনের; যা অনেক কাল কেউ হয়নি তা-ই হয়েছে সে,—রোজেলানা ধর্মপত্নী।

আরও অবাক কাণ্ড। অচিরেই দেখা গেল হারেমে সে-ই একমাত্র 'খাদিন'। সুলতান ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন অন্য 'খাদিন'দের। যার যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে তারা। যদি কেউ চায় সুলতান তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করে দিতেও রাজী।

বরের অভাব হল না। সুলতানী হারেমের ফুলের তোড়া, বাসী হলেও আপত্তি নেই কারও। মান্যরা হন্যে হয়ে ছুটে এলেন। হাতে হাতে কনে তুলে দিলেন সুলেমান। কে বলবে, এই রূপবতীরা সবাই ছিল সুলতানের নিজের হাতে চয়ন করা।

এমন ঘটনাও ঘটে। টানা সতের বছর তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী ছিল রুশ ক্রীতদাসী রোজেলানা। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৫৫৮) সুলতান সমেত সমগ্র দরবার তার বান্দা। শুধু তাই নয়, সে-ই যেন পথ দেখাল। পরবর্তী দেড়শ' বছর ধরে তুরস্কের ইতিহাস—মহিলা জমানা। ওরা বলত—'খাদিনলার সুলতানতি'। হারেমের মেয়েরাই তখন সাম্রাজ্যের ঈশ্বরী। সে কাহিনী পরে।

রোজেলানা একা নয়। হারেমের ইতিকথায় থেকে থেকেই দেখা মেলে এজাতীয় সফল নায়িকার। যথা—হিন্দুস্থানী নায়িকা লাল কনওয়ার। সে নাকি ছিল প্রখ্যাত গায়ক তানসেনের বংশের কন্যা। দিল্লীশ্বর জাহান্দার শাহের পত্নী ছিল না এই মেয়েটি, সহচরী ছিল মাত্র। কিন্তু সে-ই ছিল নাকি নূরজাহানের মত বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের আসল পরিচালিকা। জাহান্দার শাহ বান্দা ছিলেন তার।

পোশাক-আশাক এবং গহনাপত্রের কথা অবান্তর। প্রেমিকার মহলের বাবদে বাদশাহ খরচ করতেন নাকি বছরে প্রায় দু'কোটি টাকা। লাল কনওয়ার হাতির পিঠে চলাফেরা করত, মাথার ওপর থাকত তার ঝালরওয়ালা রাজছত্র, যেন সে-ই হিন্দুস্থানের অধিশ্বরী। বাদশাহ নাম দিয়েছিলেন তাকে—ইমতিয়াজমহল। ইমতিয়াজমহল বলতে তিনি উন্মাদ। দু'জনে গরুর গাড়ি চড়ে দিল্লীর বাজারে সওদা করতে যেতেন নাকি মাঝে মধ্যে। প্রজারা দেখে হেসে আকুল।

কখনও মাতাল হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা ঘুরে বেড়াতেন পথে পথে। শুধু তাই নয়, বাদশাহ-প্রণয়িণীর বান্ধবীদের বিলক্ষণ খাতির ছিল প্রাসাদে। গোলাম হোসেন—জোরা নামে চকের একটি মেয়ের কাহিনী বলেছেন। সে ছিল লাল কনওয়ারের বান্ধবী। প্রথম জীবনে ছিল নাকি সবজিওয়ালী। হাতির পিঠে চড়ে সেও আসা-যাওয়া করত বাদশাহের মহলে। তাই নিয়ে আমীর ওমরাহদের মধ্যে কানাকানি। একবার অপমানিতও হয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু কক্ষনো অপমানিত বোধ করতেন না বাদশাহ। লাল কনওয়ারকে অমান্য করেন তাঁর এমন সাধ্য নেই।

একদিন বায়না ধরল সখি—শুনেছি চিরাগ-ই-দিল্লীতে শেখ নাসিরউদ্দীন আউধি'র দরগায় গিয়ে স্নান করে এলে মেয়েরা পুত্রবতী হয়, সম্রাট চলুন না একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে!

তথাস্তু। তৎক্ষণাৎ আদেশ দেওয়া হল গাড়ি সাজাবার জন্য। জাহান্দার শাহ লাল কনওয়ারকে নিয়ে গেলেন চিরাগ-ই-দিল্লী। সেখানে নগ্ন দেহে স্নান করল কনওয়ার। তার একান্ত বাসনা—ভবিষ্যতের কোন বাদশার জননী হয় সে।

একদিন নয়, পর পর চল্লিশ রবিবার প্রেমিকাকে চিরাগ-ই-দিল্লীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন জাহান্দার শাহ। সে পুত্রবতী হয়েছিল কিনা শেষ পর্যন্ত সে খবর আমরা জানি না। কিন্তু নিজে যে সম্রাজ্ঞীর আসন দখল করেছিল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই, এসব কাহিনীই তার প্রমাণ। শোনা যায় জাহাঙ্গীরের ঢঙে জাহান্দার শাহ মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন আপন প্রেমিকার নামে। জাহাঙ্গীরের মুদ্রায় নাম থাকত নূরজাহানের, জাহান্দারের মুদ্রায় ইমতিয়াজমহলের, অর্থাৎ লাল কনওয়ারের। সে মুদ্রা অবশ্য একালের কেউ চোখে দেখেননি, কিন্তু শত শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ কানে যা শুনেছে সে খবরও নিশ্চয় উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। হারেমের কোন কাহিনীই বোধহয় পুরোপুরি অবিশ্বাস্য নয়।

উত্থান কাহিনী এখানে অনেক। অবিশ্বাস্য কাহিনী সব। ষোড়শ শতকের শেষ দিককার কথা। সুলেমানের পর তুরস্কের সিংহাসনে বসেছেন তৃতীয় মুরাদ। সুলতান-জননী নূরবানু তখন 'সুলতানা ভালিদ'। মুরাদ অপদার্থ। তাঁর হয়ে কার্যতঃ রাজ্য পরিচালনা করেন তাঁর মা। বার্ধক্যে তিনি ক্ষমতার মোহে উন্মাদিনী-প্রায়। ছেলের হাতে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নন। কিন্তু অবশিষ্ট হারেমের সাধ অন্যরকম। সেখানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে তরুণ সুলতানের প্রথমা 'খাদিন' পদটির জন্য। 'খাসমহল' যে হবে তার কাছে কিঞ্চিৎ নম্র থাকতেই হবে 'সুলতানা ভালিদ'কে।

একটি মেয়ে রূপে গুণে তামাম হারেমের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল সুলতানের দিকে। নাম তার সফি। দেখেশুনে মনে হল, সে যেন সদ্যবিগতা রোজেলানারই মন্ত্রশিষ্যা। রোজেলানার মতই ক্রীতদাসী সে। ভেনিসের মেয়ে। বাল্যে অতর্কিতে তুর্কী দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে গিয়েছিল। অনেকদিন মনে মনে আফসোস করেছে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য। এখন আর তা করে না। ভাগ্যবতী সে, সৌভাগ্য তার হাতের নাগালে। এবার আর সে মায়াবিনীকে হাতছাড়া করতে রাজি নয় সফি। সে জাল বুনতে বসল। ষড়যন্ত্র

জাল। বিচক্ষণা 'সুলতানা ভালিদ'-এর পক্ষে ক্রীতদাসীর মনের কথাটি বুঝতে দেরী হল না। তিনি সতর্ক হলেন।

সুলতান-জননী গোপনে বার্তা পাঠালেন হাটে হাটে, যেখানে যত রূপসী আছে, আমার চাই। দামের জন্য কোন ভাবনা নেই। ব্যবসায়ীরা উৎসাহী হয়ে উঠল। লাফে লাফে দর উঠতে লাগল উপরের দিকে। দু'হাত ভরে 'সুলতানা ভালিদ' কিনে নিলেন তাদের। তাঁর উদ্যোগে দেখতে দেখতে রূপসীর ভিড় জমে গেল হারেমে। সে ভিড়ে সফি নিষ্প্রভ।

সুলতানা ভালিদ-এর চাল ব্যর্থ হয়নি। সফিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সেই নবাগত রূপবতীদের ভিড়ে নিমেষে হারিয়ে গেল মুরাদ। সফি তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়। মুরাদকে যতটুকু পাওয়ার সে তা পেয়েছে। সে এখন 'খাদিন'-এর আসল প্রাপ্যটুকু চায়, 'সুলতানা ভালিদ'-এর ক্ষমতার অবসান চায়, কার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছেন সুলতান তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। যদি পারে, সফি বরং ঠেলে দেবে মুরাদকে পঙ্ককুণ্ডের আরও গভীরে। 'সুলতানা ভালিদ'-এর সঙ্গেই হাত মিলাল সে। জননী এবং জায়া দু'জনের সমবেত চেষ্টায় মুরাদ তলিয়ে গেল হারেমের রূপসাগরে। ক্লান্ত, অবসন্ন সুলতান যখন ফুলে ফুলে মধু সন্ধান করে ফিরছেন, সফি তখন গোপনে চিঠি লিখছে ক্যাথারিন ডি ম্যাডিসির কাছে। কিছুতেই আপন মুলুক ভেনিস আক্রমণ করতে দেবে না সে তুর্কীদের। সিরাজী নামে একটি মেয়ে হীরে-জহরত বেচতে আসত হারেমে, তার মাধ্যমে সফি যোগাযোগ স্থাপন করল তুর্কী রাজধানীতে বহাল ভেনিসীয় দূতের সঙ্গেও। তার হুকুমেই তুর্কী সাম্রাজ্য চলে এখন। কোথায় 'সুলতানা ভালিদ', কোথায়ই বা সুলতান, সফির নির্দেশে অটোমান সুলতানের নৌবহর পাল ঘুরিয়ে দিক বদল করে, সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রায় বের হয়।

মুরাদকে না জানিয়েই প্রথম স্বপ্ন পূর্ণ করল সফি। এবার পূরণ

করতে হবে দ্বিতীয় সাধটিও। সেই স্বপ্নের মত রাতগুলোতে মুরাদ ওকে শুধু কয়েকটি রুমালই উপহার দেননি, একটি পুত্রসন্তানও কোলে পেয়েছিল সফি। এবার লক্ষ্য স্থির করল সফি—পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে হবে। তার গর্ভের সন্তান হবে সুলতান, সে নিজে হবে 'সুলতানা ভালিদ'। চলতি কানুন অনুযায়ী সেটা সম্ভব নয়। কারণ মুরাদের প্রথমা শয্যাসহচরী হলেও 'সুলতানা ভালিদ'-এর চক্রান্তে প্রথমা 'খাদিন' হতে পারেনি সফি। তার প্রয়োজন নেই আর। পথের সন্ধান পেয়ে গেছে সফি, এখন নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাকে। তবে সতর্কতার সঙ্গে।

১৫৯৫ সন। বিলাসে রিক্ত, ব্যাধিজর্জর মুরাদ অকালে মারা গেলেন। সিংহাসনের দাবিদার সাজলেন তাঁর ভ্রাতৃবর্গ. 'সুলতানা ভালিদ'-এর অন্য পুত্ররা, এবং আরও আরও অনেকে। সফি একে একে উনিশ জনকে সরাল পথ থেকে। উনিশজন সুলতান-তনয় প্রাণ হারালেন ভেনিসীয় ক্রীতদাসীর চক্রান্তে। সিংহাসনে বসল—সফির আপন পুত্র। বেনামীতে রাজত্ব চালাতে লাগল সফি নিজেই। এখন সে শাশুড়ী তথা ভূতপূর্বা 'সুলতানা ভালিদ'-এর নিষ্ঠাবতী মন্ত্র-শিষ্যা যেন।

ভূতপূর্বা 'সুলতানা ভালিদ'-এর মতই অদ্ভুত ক্ষমতার নেশা পেয়ে বসেছে সফিকে। পুত্র সাবালক। কিন্তু সফি তবু হারেমের চারিটি কক্ষ নিয়ে পড়ে থাকতে রাজী নয়। তরুণ সুলতানকে সেও ঠেলে দিল বিলাসের সমুদ্রে। নবীন সুলতান যখন সেখানে ভাসমান তখন তাঁর নামে রাজত্ব চালায় তার মা। 'সুলতানাভালিদ' সফি। রোজেলানার ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে চলল সে সগৌরবে সামনের দিকে।

অবশেষে তার গল্পও একদিন ফুরোলো। একদিন ভোরে ঘরে ঢুকে বাঁদী দেখল আপন শয্যায় লুটিয়ে আছে 'সুলতানা ভালিদ'-এর মৃতদেহ। দেহের কোথাও অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই, শয্যা তেমনই

ধবধবে। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিল বাঁদী। কিন্তু দ্বিতীয় চীৎকারের অবসর পায়নি সে। ওরা এসে জোর করে ধরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। বাঁদী পরে শুনেছিল—ক্রীতদাসী থেকে সম্রাজ্ঞী হয়েছিল যে ভাগ্যবতী, তুষমন তাকে হত্যা করেছিল গলা টিপে।

এজাতীয় উত্থান এবং পতনের গল্প হিন্দুস্থানের হারেমগুলোতেও অনেক। সিরাজউদ্দৌলার বেগম লুৎফাও ক্রীতদাসী ছিল। সে সিরাজ-জননীর বাঁদী ছিল। নাম ছিল তার রাজ কনওয়ার। সিরাজ নাম দিয়েছিলেন তাকে লুৎফাউন্নিসা। সিরাজের বিবাহিত পত্নীও ছিল। মহম্মদ ইজরি খানের কন্যা উমদাতউন্নিসাকে মহাসমারোহে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন তিনি। কিন্তু ইতিহাসে চাপা পড়ে আছেন উমদাতউন্নিসা। সুখে তুঃখে নবাবের সত্যিকারের জীবনসঙ্গিনী লুৎফা।

লুৎফা কোন বাঁকা সিঁড়ি ধরে এগোননি। স্বাভাবিক তাঁর কাহিনী, সিরাজকেই তমাল-তরু বলে আশ্রয় করেছিলেন এই মাধবীলতা। নবাবের ভাগ্যের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। হারেমে সেটা কদাচিৎ স্বাভাবিক পন্থা। সেখানে ক্ষমতা-সাধিকার কাছে কোন পথই অধর্মের নয়।

স্থান—লক্ষ্ণৌ। কাল—নাসিরউদ্দীনের আমল। রূপবতী নারী সম্পর্কে তুর্বলতা ছিল নাসিরউদ্দীনের। তার হারেমে ফিরিঙ্গী বিবি ওয়াল্টারস্-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। নবাবের খাসমহলে ছিলেন—সম্রাট শাহ আলমের এক দৌহিত্রী। তিনি মুঘল হারেমের মেয়ে—সর্বগুণসম্পন্না, সুশিক্ষিতা। খেয়ালি নবাব নাসিরউদ্দীনকে মোটে বরদাস্ত করতে পারতেন না এই গর্বিতা শাহজাদী। তিনি আপন মহলে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেন। নাসিরউদ্দীনের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই তাঁর। তাতে যে নবাবের মনে বড় তুঃখ এমন নয়। তাঁর হারেমে তিল ধারণের ঠাঁই নেই, খোপে

খোপে নানা জাতের তরুণী বোঝাই। তাদের মধ্য থেকেই একজনকে তখনকার মত সঙ্গিনী করে নিলেন তিনি। নাম তার—আফজল-মহল।

১৮২৫ সনের কথা। সমগ্র লক্ষ্ণৌ শুনল আফজলমহল পুত্রবতী হয়েছেন। নবাব ছেলের নাম রেখেছেন—মুন্নাজান। শিশু মুন্নাজানকে বুকের দুধে লালন করার জন্য স্বাস্থ্যবতী নারী চাই। নবাবজাদারা সাধারণতঃ মায়ের দুধ পেতেন না হারেমে। ও কাজের দায়িত্বও দাসী-বাঁদীদেরই ওপর। খবর শুনে ভিড় জমে গেল প্রাসাদের দুয়ারে। শত শত গরীব মা এসে দাঁড়িয়েছেন প্রার্থী হয়ে। নবাবের হেকিম দেখেশুনে বেছে নিলেন একজনকে। মেয়েটির নাম দুলারী।

দুলারী হিন্দুর মেয়ে। মা বাবা তার খুবই গরীব। ফতে মুরাদ নামে এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ওর বাবা একবার ষাটটি টাকা ধার করেছিল। টাকাটা শোধ দেওয়ার আগেই বেচারা মারা যায়। ঋণের দায়ে কয়েদ হল মা আর মেয়ে। দুলারীকে জমা রেখে মা বের হল টাকার সন্ধানে। কোথায় পাবে হতভাগী টাকা? সে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। এদিকে ফতে মুরাদের এক বোন হঠাৎ একদিন মেয়েটিকে দেখে মহাখুশি। ছোট্ট মেয়ে দুলারী দেখতে বেশ, তাছাড়া খুব চটপটে। সে কয়েদ থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এল। দুলারী সেখানে দিনে দিনে বেড়ে উঠল। রূপবতী তরুণী। বন্য হরিণীর মত শরীর, হরিণীর মতই চঞ্চল। তার প্রতিটি ভঙ্গীতে তরঙ্গ। বাড়িতে রুস্তম নামে একটি তরুণ ছিল। সে দুলারীর প্রেমে পড়ে গেল। ফতে মুরাদ জানতে পেরে দু'জনকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরেই মারা গেল প্রভু। রুস্তম দুলারীকে নিয়ে নেমে এল পথে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা ঠেকল এসে লক্ষ্ণৌএ। রুস্তম সহিসের কাজ করে। নগরের হাওয়া লেগেছে দুলারীর মনে, নিজের অজান্তেই

ধীরে ধীরে সে নাগরী হয়ে উঠেছে। সহিসের বেয়ের ঘরে নানা লোকের আনাগোনা। প্রধানতঃ রুস্তমেরই ইয়ার-দোস্ত ওরা। সুতরাং, রুস্তম পড়শীর কথা বিশেষ গায়ে মাখায় না। ইতিমধ্যেই একটি পুত্রসন্তান এসেছিল তুলারীর কোলে। এবার এল একটি কন্যা। কেউ বলে বাপ ওর রুস্তমই, কেউ বলে—তা নয়, তুলারীর আসল সোয়ামি এখন বস্তির ওই মাহুত। অন্যরা এই কন্যার পিতৃত্বের গৌরব দিতে চায় পল্লীর এক কামারকে।

বহুভোগ্যা সেই তুলারীই এল নবাবের হারেমের মুন্নাজানকে লালন করতে। হারেমে জাত নিয়ে কোন তুর্ভাবনা নেই। লক্ষ্ণৌরই এক নবাব বিয়ে করেছিলেন চকের এক ফুলওয়ালীকে। শোনা যায়, আমজাদ আলি শাহ তা করেছিলেন প্রতিহিংসায়। তাঁর একটি প্রিয় বাঁদীর ফুলের মত মুখটিকে জ্বলন্ত অঙ্গারে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন জনাব আউলিয়া বেগম, নবাবের খাসমহল। সে মেয়েটিও নবাব-জাদার তদারকির জন্যই এসেছিল হারেমে। আমজাদ আলি তাকে কাছে ডাকলেন। খাসমহল খবর শুনে উদ্বিগ্ন। তিনি শুনলেন—বাঁদী হয়েও বেগমের মত আচরণ করছে মেয়েটি। অন্য বাঁদীরা ফিস-ফিস করে এটাও জানাতে ভুলল না—ওর পেটে নবাবের সন্তান, অচিরেই মা হবে ফুলওয়ালী।

শুনে রাগে ঠোঁট কামড়ালেন আউলিয়া বেগম। তারপর সর্পিণী সুযোগ বুঝে একদিন ছোবল দিলেন। বাঁদী আপন মনে ঘুমিয়ে ছিল নিজের ঘরে, খাসমহলের ইঙ্গিতে কেউ এসে জ্বলন্ত অঙ্গার ঢেলে দিয়ে গেল তার মুখে। চিরকালের মত রূপ হারাল গরবিনী। আমজাদ আলি তারই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন নাকি ক'দিন পরেই এক ফুলওয়ালীকে বিয়ে করে। আউলিয়া বেগম সেদিনও ক্রোধ গোপন করতে পারেননি। দাসদাসীদের সামনেই ধিকৃত হয়েছিলেন নবাব—এই আপনার রুচি! শেষে কিনা চকের এক ফুলওয়ালীকে তুলে আনলেন ঘরে! এই বাঁদী-বান্দার দল কালও ফুল কিনেছে ওর কাছ

থেকে। কী বলবে ওরা আজ? বলবে—ওই দেখ, ফুলওয়ালীর স্বামী যাচ্ছে। অপমানে লজ্জায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন আমজাদ আলি। জবাবে তিনি নাকি ধীর স্বরে বলেছিলেন—আমি কোরাণ শরিফ অমান্য করিনি। এখনও ইচ্ছে করলে আরও দু'একটি বিয়ে করার অধিকার আমার আছে!

বিবেচ্য ছিল একমাত্র সেটাই,—শাস্ত্রকে অমান্য করা না হলেই হল। অনাচারী হওয়ার প্রয়োজন নেই, পথ তো সামনে খোলাই আছে। স্থির করতে হবে শুধু কী ধরনের বিয়ে করতে চান সুলতান কিংবা নবাব। 'নিকা' অথবা 'মুতা'—আইনসম্মত বিয়ে অথবা বাঁ হাতের ব্যাপার—কোন্‌টায় আগ্রহী তিনি। 'নিকা' চারটের বেশি চলে না, কিন্তু 'মুতা' যত খুশি। তাছাড়া, বিয়ে করতেই হবে তারই বা কী কথা আছে!

সুতরাং, শাস্ত্র নিয়ে ভাববার কিছু নেই। ভাবনা নেই জাতি নিয়েও। হারেম এক অদ্ভুত রাজ্য, এখানে একমাত্র ছাড়পত্র রূপ আর যৌবন। পশ্চিম এশিয়া তো বটেই, মিশর, ইতালি, গ্রীস, রাশিয়া—বিশ্বের নানা দেশের নারী ছিল দিল্লীর মুঘল হারেমে। বিখ্যাত উদিপুরী বেগম জর্জিয়ার মেয়ে। হারেমে আসার পর বাদশাহের কাছে সকলেরই ধর্ম ইসলাম। আকবর উদার সম্রাট। তিনি বেগমদের ধর্মান্তারত করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁর হারেমে হিন্দু মেয়ে শিবপুজো করত। অতএব জাতি বা ধর্ম হারেমে ততখানি গুরুতর প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন কার দেয় কী আছে। হিন্দুর শাস্ত্র যদি বলে—নদী, নারী আর কুলের উৎস খুঁজতে নেই, তাহলে বাদশাহী ন্যায় বলে—আর সব বাহ্য, আগে কহ—। শাজাহান অতি সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছিলেন তামাম হারেম অধিপতিদের মনের কথা। তাঁর আমলে দিল্লীতে কাঞ্চনী নামে এক নর্তকী সম্প্রদায় ছিল। সপ্তাহে দু'দিন তারা প্রাসাদে এসে নাচত। প্রত্যেকেই ওরা সুশিক্ষিতা, সুন্দরী। সুতরাং, দরবার

ছাড়া আর কোথাও তাদের পা না পড়লেও, তাদের ঘরে পা পড়ত নিশ্চয় রাজধানীর বিলাসী পুরুষদের। সামাজিক দৃষ্টিতে ওদের স্থান তাই মোটেই উঁচু ছিল না। পাঁচজনে রূপোপজীবিনী হিসাবেই গণ্য করত ওদের। হঠাৎ এই কাঞ্চনবালাদেরই একজনের প্রেমে পড়ে গেলেন সম্রাট শাজাহান। আমীর ওমরাহরা মনে মনে বললেন—তোবা! তোবা! শেষে কিনা কাঞ্চনবালা! তাদের মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধ হয় একটা বয়েৎ আওড়েছিলেন সুরসিক সম্রাট—"মিঠাই নেক্ হর দোকান কিস্ বাসাদ!" যে দোকান থেকেই কিনে আনো না কেন, মিঠাই সমানই মিষ্টি!

সুতরাং নাসিরউদ্দীন যেদিন দুলারীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন তাঁর রুচিবিকার ঘটেছিল এমন বলা যায় না। সমসাময়িকরা স্বীকার করেছেন—দুলারীর রূপ ছিল। পিতা গাজীউদ্দীন তখনও বেঁচে। নাসিরউদ্দীন তাঁকে ধরে পড়লেন—আমি দুলারীকে সাদি করতে চাই। গাজীউদ্দীন অমত করতে পারলেন না। পথের মেয়ে দুলারী বেগম হয়ে গেল। অবশ্য নাসিরউদ্দীন তখনও যুবরাজ। এসব ১৮২৬ সনের কাহিনী।

পরের বছরই লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে বসলেন নাসিরউদ্দীন। দুলারীর নাম হয়ে গেল মালিকা জামানি, কালের রানী। নতুন বেগম এবার বসল নিজের সংসার গোছাতে। ছেলেমেয়ে দুটিকে সে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল হারেমে। ছেলের নাম—কৈয়ান। সে এখন বড় হয়েছে। দুলারী তার সঙ্গে বিয়ে দিল গাজীউদ্দীনের এক ভাইঝির। কন্যার বিয়ে হল—নবাব পরিবারেরই এক তরুণের সঙ্গে।

অতঃপর এখানেই থেমে থাকার কোন অর্থ হয় না। দুলারী নবাবের কাছে হাত পাতল। বলল—আমার বুঝি মাসোহারা চাইনে নবাব! বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়ে গেল নবাবের প্রিয় বেগমের জন্য। পর দিনই দুলারীর নতুন আবদার—আরও একটি নিবেদন ছিল নবাব, কৈয়ানকে কি কিছুতেই ভবিষ্যতের নবাব বলে ঘোষণা করা

যায় না ? নাসিরউদ্দীন তখন দুলারীর দাস। তিনি বললেন—বেশ, তাই হবে। লক্ষ্ণৌর বৃটিশ রেসিডেন্ট চিঠি পেলেন নবাবের কাছ থেকে। নবাব ঘোষণা করেছেন—কৈয়ান তাঁর পুত্র, এবং সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

রেসিডেন্ট আমতা আমতা করে জবাব দিলেন—নবাবের বক্তব্যকে অস্বীকার করছি না আমরা। তবে মুশকিল এই, গোটা লক্ষ্ণৌ জানে কৈয়ান যখন তার মা'র সঙ্গে হারেমে আসে তখন সে তিন বছরের বালক। এমতাবস্থায়—।

রাগে ফেটে পড়লেন নবাব—কে আমার পুত্র সেটা কি পথের মানুষের কাছে জেনে নিতে হবে ? তিনি অভিযোগ পেশ করলেন খোদ গভর্ণর-জেনারেলের কাছে। শুধু তাই নয়, গভর্ণর-জেনারেল লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন বেড়াতে। নবাবের তরফ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনার দায়িত্ব দেওয়া হল কৈয়ানের ওপর।

কাণ্ড দেখে রেসিডেন্ট স্তম্ভিত। নাসিরউদ্দীনকে তিনি মনে করিয়ে দিলেন—কৈয়ান নয়, তাঁর পুত্র আসলে মুন্নাজান। মৃত নবাব গাজীউদ্দীন মুন্নাজানের জন্মক্ষণেই সে আনন্দবার্তা জানিয়ে রেখে গেছেন রেসিডেন্টকে। ইচ্ছে করলে নবাব সে চিঠি দেখতে পারেন। নাসিরউদ্দীন বললেন—আমি মিথ্যে বলেছিলাম। নির্লজ্জ নবাব সেখানেই থামলেন না। তিনি জানতে চাইলেন—তোমরাই বল, কী করে মুন্নাজানের জনক হলাম আমি, অন্দরে সবাই জানে আমি কোনদিন ওর মায়ের সঙ্গে রাত কাটাইনি। বাধ্য হয়েই রেসিডেন্টকে মেনে নিতে হল নবাবের বক্তব্য।

এ অবধি দুলারী বিজয়িনী। কিন্তু তার সৌভাগ্য-সূর্যও অপরাহ্নে পড়ল একদিন। কেননা, হারেমে নতুন সরবরাহ অব্যাহত। সন—১৮৩২। নতুন করে চিঠি লিখতে বসলেন নাসিরউদ্দীন। এবার আরও চমকপ্রদ বক্তব্য তাঁর। রেসিডেন্টকে তিনি জানালেন—মুন্নাজান যে আমার পুত্র নয় সে কথা আগেই তোমাকে বলেছি।

এবার বলছি—কৈয়ানও আমার পুত্র নয়। ঘটনার চাপে মিথ্যে বলতে হয়েছিল আমাকে। দয়া করে আমার আগের বক্তব্য শুধরে নাও। আমি ঘোষণা করছি, আমার নিজের কোন পুত্রসন্তান নেই।

মন্ত্রী আগা মীর সাক্ষ্য দিলেন নবাবের সমর্থনে। মুন্নাজানের জন্মের ছ'বছর আগে থেকে আফজলমহলের সঙ্গে নবাবের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সুতরাং, মুন্নাজান নব'বের সন্তান এমন কথা বলা চলে না। আর কৈয়ান? তার কাহিনী তো সবাই জানে।

৭ জুলাই, ১৮৩৭। নাসিরউদ্দীন মারা গেলেন। সন্দেহাতুর মানুষ ছিলেন তিনি। সব সময় ভয় তাঁর—এই বুঝি কেউ বিষপ্রয়োগ করল। নবাবের তুই বোন ছিল হারেমে। তাদের বাদ দিলে শেষ বয়সে আর কাউকে বিশ্বাস করতেন না নবাব। রাত্রির অন্ধকারে প্রাসাদের একটি কুয়ো থেকে তারা জল এনে দিত ভাইকে। শোবার ঘরের একটি আলমারিতে জলের কুঁজোটাকে নিজের হাতে তালা দিয়ে রাখতেন নবাব। চাবিটা ঝুলানো থাকত তাঁর গলায়। রটে গেল, ওই বোনেরাই বিষ খাইয়েছে নবাবকে। রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষে সে খবর তত গুরুতর নয়, তার চেয়েও জরুরী বিষয়—নাসিরউদ্দীন বেঁচে নেই। রাত শেষ হওয়ার আগেই সমগ্র ভাবতকে জানাতে হবে—লক্ষ্ণৌর নবাব কে!

ওঁরা নবাব-গড়ার কাজে নামবার আগেই আসরে অবতীর্ণ হল তুলারী। কৈয়ানকে সিংহাসনে বসাতে সে বদ্ধপরিকর। ওদিকে হারেমের অন্য মহলেও ব্যাপক প্রস্তুতি। মৃত নবাবের জননী, 'পাদশাহী বেগম' মুন্নাজানের পক্ষ নিয়েছেন। তিনিও আপন সংকল্প কার্যে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। প্রাসাদে প্রবল উত্তেজনা। উত্তেজনা গোটা শহরে। দাঙ্গা লাগে-লাগে। রেসিডেন্ট তথা ইংরাজরা আগেই মনস্থির করে রেখেছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত—এই তুই দাবিদারের কেউ নয়, নবাব হবেন নাসিরউদ্দীনের এক খুল্লতাত নসিরউদ্দৌলা। কৈয়ানের দাবি তাঁরা বহুকাল আগেই

নাকচ করে দিয়েছিলেন। নাসিরউদ্দীনের চিঠির পরে নাকচ হয়ে গেছে মুন্নাজানের দাবিও। তর্কের মীমাংসা হিসাবে খুঁজে বের করা হয়েছে তৃতীয় একজনকে। গোপনে তাঁর অভিষেক হল। কামান-গর্জনের মধ্যে সিংহাসনে বসলেন নসিরউদ্দৌলা। তাঁর দরবারী নাম হল—মহম্মদ আলি শাহ্। কৈয়ান হারিয়ে গেল। চিরকালের মত হারিয়ে গেল তুলারীও। হারেমে কিছুই নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত নয়।
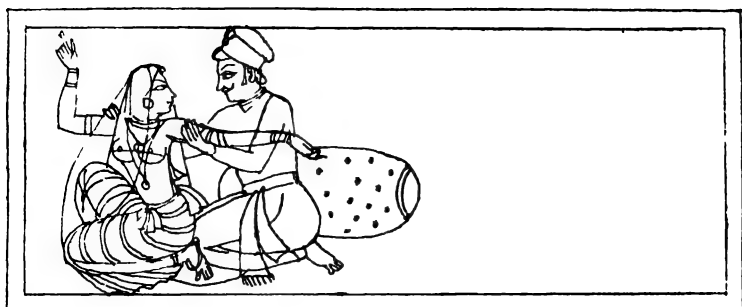
সাফল্য আর ব্যর্থতা এখানে পাশাপাশি চলে। কার সঙ্গে কখন দেখা হবে কেউ তা জানে না। তুর্কী হারেমের আর একটি উচ্চাভিলাষী রমণীর কথা। নাম তার—কিউসেম। আমরা বলব—কুসুম। কেননা, প্রস্ফুটিত ফুলের মতই ছিল নাকি তার রূপ।

সফি বিদায় নেওয়ার কিছুকাল পরের কথা। অটোমান সাম্রাজ্যে তখনও জেনানা-রাজ চলেছে। প্রথমে এলেন সুলতান আহামদ। তিনি পুরোপুরি হারেমের মেয়েদের হাতের পুতুল ছিলেন। তারপর এলেন প্রথম মুস্তাফা। তিনি উন্মাদ। তারপর দ্বিতীয় ওসমান। তিনি রাজ্য পরিচালনায় উৎসাহ দেখানো মাত্র নিহত হলেন প্রাসাদরক্ষীদের হাতে। পর পর এই তিন সুলতানের আমলে সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন আসলে কুসুম। তিনি চতুর্থ মুরাদ আর কুখ্যাত ইব্রাহিমের মা। মুরাদ সিংহাসনে বসলেন ১৬২৩ সনে। বেশি দিন রাজ্য পরিচালনা করতে হয়নি তাঁকে। জীবনে প্রথম সূর্যগ্রহণ দেখে তিনি নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, দিন-রাত্তির মুখ-গোমড়া করে বসে থাকতেন মদের পেয়ালা হাতে। ফলে, মাত্র আটাশ বছর বয়সে বিদায় নিতে হল তাঁকে। তাঁর মৃতদেহ নিয়েই

'কাফেস'-এর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল প্রাসাদের রক্ষীদল। বলেছিল—ঘাতক মৃত, আমরা ইব্রাহিমকে চাই!—ইব্রাহিমকে!

ইব্রাহিমকে মুরাদই নিক্ষেপ করেছিলেন কারাগারে। মৃত্যুর আগে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন—ওকে হত্যা করা হোক। সুলতান-জননী কুসুমের নির্দেশে ঘাতকেরা ফিরে এসে মিথ্যে সংবাদ জানিয়েছিল সুলতানকে—আপনার আদেশ পালিত হয়েছে।

বিস্ময়ে হতবাক্ সেই ইব্রাহিম এসে বসলেন এবার তুরস্কের সিংহাসনে। তাঁর মত অপদার্থ, বিকৃত মনের মানুষ সম্ভবত আর কোনদিন তুরস্কের সিংহাসনে বসেননি। উজীর কারা মুস্তাফা চেয়েছিলেন সুলতানকে সংযত করতে। কিন্তু নিজেই পড়ে গেলেন বিপাকে। হারেমের একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। উজীরের পক্ষে সেটা চরম অপরাধ। সুলতানের আদেশে হত্যা করা হল তাঁকে। পরবর্তী উজীর সুলতানের পুরোপুরি সমর্থক। তাঁর যাবতীয় ব্যভিচার, অনাচারে তিনি অন্যতম উৎসাহদাতা। ফলে দেখতে দেখতে সুলতানের বিলাস-কাহিনী প্রবাদে পরিণত হল। সুলতান-জননী কুসুম নিঃশব্দে দেখে চললেন সব।

সেবার এক কাণ্ড হল। সুলতানের প্রধান খোজা একটি রূপবতী মেয়ে কিনে নিয়ে এল হাট থেকে। ইব্রাহিমের জন্য নয়, নিজের জন্য। যদিও খোজা, তবু অনেক 'কিস্‌লার আগা' সুলতানী ঢঙে হারেম সাজাতো। আর কোন কারণে নয়, শুধু নিজেদের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য। এবার মেয়েটিকে কিনেছে সে পারসিকদের কাছ থেকে। কিনেছিল বটে কুমারী মেয়ে, কিন্তু কিছুদিন পরেই খোজা শুনল যে মেয়েটি গর্ভবতী। শুনে খোজা রেগে আগুন। কিন্তু মেয়েটিকে হত্যা করল না সে। হত্যা করল না শিশুটিকেও।

প্রায় একই সময়ে ইব্রাহিমও জনক হয়েছেন। তার অসংখ্য ক্রীড়া-সঙ্গিনীদের একজন একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছে সুলতানকে। আনন্দিত সুলতান ছেলের নাম রাখলেন—মাহমুদ। মাহমুদকে

প্রতিপালন করার জন্য 'কিস্‌লার আগা'র বাঁদী নিযুক্ত হল হারেমে। অনেকটা তুলারীর কাহিনী যেন   মেয়েটি নিজের পুত্রকে কোলে নিয়েই এল প্রাসাদে। ইব্রাহিম দাসীর ছেলেকে দেখে নিজের ছেলেকে ভুলে গেলেন। তিনি বললেন—কে বলে এ দাসীপুত্র? দাসীপুত্র আসলে আমার ছেলেই।—আমি দত্তক নেব একে। মাহমুদের মা ব্যঙ্গ করে বললেন—তুরস্কের সুলতানের পক্ষে সেটাই তো হবে সঙ্গত কাজ। বেগমের কথা শুনে দপ করে জ্বলে উঠলেন ইব্রাহিম। মাহমুদকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সামনের একটি জলাধারে। ছেলেটি জলে ডুবে মারা গেল না বটে, কিন্তু আমরণ একটি কাটা দাগ ছিল তার কপালে। পিতৃক্রোধের স্মারক।

'কিস্‌লার আগা' সুলতানের কাণ্ডকারখানা দেখে বিবাগী হয়ে উঠল। সে স্থির করল মক্কা যাবে। তারপর সেখান থেকে চলে যাবে মিশরে, সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটাবে। নিজের হারেম এবং সঞ্চিত যাবতীয় ধনসম্পদ নিয়ে মক্কা যাত্রা করল 'কিস্‌লার আগা।' পথে রোডস্ দ্বীপে মাল্টার নৌবাহিনী এসে আক্রমণ করল তাকে। বীরের মত মৃত্যু বরণ করল আগা। তার সমুদয় সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল। সেই লুটের মালে ওরা একটি কিশোরকেও পেয়ে গেল। চারদিকে রটে গেল তুরস্কের সুলতান-পুত্র বন্দী হয়েছেন, আগার সঙ্গে বেচারা আলেকজান্দ্রিয়া যাচ্ছিল পড়াশুনা করতে! সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি সে বালকের উপর নিবদ্ধ। সকলেই তাকে রক্ষা করার জন্য উদ্‌গ্রীব। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি বেঁচে ছিল অবশ্য খ্রীস্টান সন্ন্যাসী হয়ে! তার নাম হয়েছিল—ফাদার অটোমান। কার পুত্র ছিলেন তিনি?

ইব্রাহিম সব শুনে স্তম্ভিত। তিনি তক্ষুনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন মাল্টিজদের বিরুদ্ধে। কুড়ি বছর ধরে চলেছিল সেই যুদ্ধ। সে অন্য কাহিনী। এখানে তা অবান্তর। ইব্রাহিম এবং তার জননী

কুসুমের কথাই আপাততঃ বেশি গুরুতর। যুদ্ধ ঘোষণা করার উৎসাহ থাকলেও যুদ্ধ পরিচালনার যোগ্যতা ছিল না ইব্রাহিমের। হারেমই ছিল তাঁর জীবনে একমাত্র আকর্ষণ, একমাত্র নেশা। রাজত্ব চালাতেন 'সুলতানা ভালিদ' কুসুম। সেজন্য মায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই ইব্রাহিমের। তাঁর হাতে 'সুলতানা ভালিদ'ও নিগৃহীত। কুসুম স্থির করলেন—দৌরাত্ম্য আর বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। গোপনে তিনি দরবারের বিশিষ্ট কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সৈন্যদলের তরফ থেকেও কয়জন প্রতিনিধি এসে দেখা করল তাঁর সঙ্গে। প্রথমেই তিনি পুত্রকে টেনে নামাতে রাজী হলেন না। কিন্তু ওরা অন্য কোন মীমাংসা প্রস্তাবই শুনবে না। বাধ্য হয়েই জনতার দাবি মেনে নিতে হল কুসুমকে। ইব্রাহিম আবার নিক্ষিপ্ত হল কারাগারে।

সিংহাসনে এসে বসল তরুণ সুলতান মহম্মদ। তাঁরও মা আছে। অর্থাৎ আর একজন 'সুলতানা ভালিদ'। এবার দুই রমণীর লড়াই। বয়স হয়েছে কুসুমের। দ্বিতীয় 'সুলতানা ভালিদ' তুরকান অপেক্ষাকৃত নবীনা। তারুণ্যের কাছে হার মানল অভিজ্ঞতা। ইব্রাহিমকে অনেক চেষ্টায় কারাগারে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন কুসুম। এবার আর পারা গেল না। তুরকানের ইঙ্গিতে হত্যা করা হল তাঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে দিন ফুরলো কুসুমেরও। তাঁর হাতে আপনজন বলতে আর এমন কেউ নেই যাকে সিংহাসনে বসানো যেতে পারে। কিন্তু তবু ক্ষমতার লালসা! আবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন কুসুম। এবার পরামর্শ করলেন তিনি প্রাসাদরক্ষীদের প্রধানের সঙ্গে। এর আগে সাফল্যের সঙ্গে অনেকবার ওদের কাজে লাগিয়েছেন কুসুম। এবারও প্রথম দিকে সব ভালোয় ভালোয়ই চলল। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রাপ্ত উজীর। সঙ্গে আছি বলেও তিনি প্রতারণা করলেন কুসুমকে। তাঁর নায়কত্বে আর একদল সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল কুসুমের

বিরুদ্ধে। তাদের প্রতিজ্ঞা—আমরা জান দিয়ে রক্ষা করব নতুন সুলতানকে। মুফতি রায় দিলেন—ষড়যন্ত্রকারী কুসুমের একমাত্র প্রাপ্য প্রাণদণ্ড। স্পষ্টতঃই বিজয়িনী এখন তূরকান। তাঁর সমর্থকরা হানা দিল কুসুমের ঘরে। কিন্তু ঘর শূন্য, কুসুম সেখানে নেই। অবশেষে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল পোশাকের একটি পেটির পিছনে। সেখান থেকে টেনে বাইরে আনা হল তুর্কী সাম্রাজ্যের এককালের অধীশ্বরীকে। তাঁকে বিবস্ত্র করা হল। তারপর প্রকাশ্য দিবালোকে হারেমের তোরণে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল তাঁকে। অথচ এই কুসুমই ছিলেন পর পর সুলতানের আমলে তুর্কী সাম্রাজ্যের সত্যিকারের পরিচালিকা। সম্মানের তুলনা ছিল না তাঁর সেদিন, ক্ষমতায়ও তিনি ছিলেন সকলের উপরে।

কুসুম অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। অনেক দূর এগিয়েছিল সফি, দুলারী এবং আরও কেউ কেউ। বাঁদী থেকে বেগম, সাধারণ নর্তকী থেকে সুলতানা,—হারেমে এমন ঘটনা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সেটা চাঁদের এক পিঠের খবর মাত্র। এসেছিল অনেকেই, কিন্তু ক'জনের সাধ পূর্ণ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত? ভাগ্যবতীর তালিকাটি নাতিদীর্ঘ, তার চেয়ে অনেক বেশি ভিড় যেন নিষ্ফলের, হতাশের দলটিতে।

তুর্কী হারেমের সে দুঃখের কাহিনী জানে বসফরাস-এর নীল জল। বিদেশী নাবিক হারানো ধনের সন্ধানে সেই জলে ডুব দিতে গিয়ে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই পৃথিবীর জন্য খুঁজে পেয়েছিল এক হৃদয়-বিদারক কাহিনী। স্বচ্ছ জলের তলায় এখানে ওখানে পড়ে আছে অজস্র শব। একদা রূপবতী নারী ছিল ওরা, এখন পূতিগন্ধময় অবশেষ মাত্র। নূপুরের বদলে পায়ে প্রত্যেকের পাষাণভার। আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে আপন জাহাজে ফিরে এসেছিল নাবিক। পৃথিবী শুনে কেঁদেছিল। কেউ কেউ মনে মনে ভেবেছিল—আরও একটি নাবিকের গল্প। অর্থাৎ, নেহাতই গল্প।

পরে জানা গিয়েছিল, ঘটনা সত্য। তুর্কী হারেমে হামেশাই

এমনটি ঘটে থাকে। কোন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেই নির্দয় হাতে অপরাধীকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় বসফরাস-এর জলে। বিচার করেন সুলতান স্বয়ং। 'কিস্‌লার আগা' মেয়েটিকে অতঃপর তুলে দেবে ঘাতকের হাতে। তাকে বলা হত 'বোসতান জী-বাস্‌ই'। সঙ্গে একজন খোজাকে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে জলে ডিঙ্গি ভাসাত সে। ডিঙ্গির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত আর একটি ডিঙ্গি। তাতে মেয়েটির শব, পায়ে তার বিশাল পাথর বাঁধা। মাঝখানে গিয়ে দড়ি কেটে দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে ডুবিয়ে দেওয়া হত দ্বিতীয় ডিঙ্গিটি। তারপর 'বোসতান জী-বাস্‌ই' ফিরে আসত প্রাসাদের ঘাটে। অনেক সময় জীবিত মেয়েদেরও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত।

একজন কি তু'জন মেয়েকে বিসর্জন দেওয়া নাকি কিছুই নয়। তুর্কী হারেমের কাহিনীতে এমন ঘটনাও আছে যখন একসঙ্গে তিনশো মেয়েকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। অপরাধ—ষড়যন্ত্র। আপন আপন ভাগ্যকে মেনে নিতে রাজী হয়নি ওরা, অতৃপ্ত মেয়েরা আরও কিছু চেয়েছিল। সেই স্বপ্নেরই দাম দিতে হল জীবন দিয়ে। এ অপরাধ এবং শাস্তি তুই-ই তবুও অনুমান করা যায়, কিন্তু কোন সামান্যা নারীকে ডুবিয়ে মারবার আগে সত্যিই কি কোন অপরাধের ছুতো দরকার হত অটোমান সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তিমান সুলতানের? মনে হয় না। সুলতান ইব্রাহিম গোটা হারেম বসফরাস-এর জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন শুধু মজা করার জন্য। ক্ষতি কিছু নেই, অথচ আমুদে সুলতানের লাভ অনেক—নতুন করে আবার একটি হারেম সাজানো যাবে, নব নব হুরীর পদসঞ্চারে আবার জমজমাট হয়ে উঠবে বেহস্ত!

'আরব্য উপন্যাসের' এক স্বনামধন্য নায়ক সুলতান শাহরিয়র-এরও কোন কৈফিয়ৎ দরকার হত না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোনীতা তিলোত্তমাকে নিয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেন তিনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এশিয়ার হারেম সমূহে সেটাই ছিল চলতি রীতি।

নায়িকাকেই ভীরু কপোতীর মত এগিয়ে যেতে হত সুলতান বাদশাহের বিলাস-শয্যার দিকে, নায়ক তার ঘরে পা দিতেন দৈবাৎ। সেটা রীতি নয়, নিতান্তই ব্যতিক্রম, ব্যক্তিগত আচার। কামাতুর শাহরিয়র প্রবল আগ্রহে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতেন অভিসারিকা নায়িকাকে। তাঁর তুল্য প্রেমিক যে-কোন নারীর গৌরব, সানন্দে নিজেকে সমর্পণ করত হারেম-কন্যা। তখনও সে জানে না, এই প্রথম মিলনরাত্রিটিই তার জীবনের শেষ রাত। রাত-ভোরে আপন হাতে তাকে হত্যা করতেন শাহরিয়র। এক রমণী দু'বার তাঁর সঙ্গিনী হতে পারেনি কোন দিন। সে যাতে আর কোন পুরুষে আসক্তি দেখাতে না পারে তার জন্যই এই ঘৃণ্য বিধান।

ঈর্ষায় শাহরিয়র হারেম-প্রভুদের প্রতীক মাত্র। সিরিয়ার কুখ্যাত নায়ক দাজির পাশা একই ব্যাধিতে পীড়িত, হীন খুনী। একটি হারেম-কন্যা কোন ক্রীতদাসকে ভালবেসেছিল। সে অপরাধে যাবতীয় 'মেমলুক'কে হত্যা করা হল। 'মেমলুক' শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস। তার চেয়েও কুটিল দাজির পাশার মন। একালের শাহরিয়র সে। অঙ্কশায়িনী মেয়েটির সতীত্ব রক্ষার চিন্তায় উদ্বিগ্ন দাজির কোমর থেকে বাঁকা ছুরিটা তুলে নিল হাতে। তৃপ্ত, আনন্দিত, অবসন্ন মেয়েটি তখনও ঘুমোচ্ছে। দাজির নিঃশব্দে ছুরিটি বসিয়ে দিল তার বুকে। একটি তীব্র আর্তনাদ। তারপরই সব চুপচাপ। মেয়েটি জেনে যেতে পারল না—হত্যাকারী সেই পুরুষটিই, কিছুক্ষণ আগে যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ, প্রিয়তম আপনজন।

নারীকে বিশ্বাস নেই,—হারেমের অধিপতিদের মনে মনে নিয়ত এই গুঞ্জন। হারেমের পরিকল্পনার পেছনেও কার্যতঃ এই ধারণারই প্রকাশ। আরবের লোকেরা নাকি বলে—মূল্যবান মণি-মুক্তা তালা দিয়ে গোপনে রাখাই ভাল। এখানে-ওখানে ফেলে রাখা ঠিক নয়। যে কেউ চুপিসারে হাতে তুলে নিতে পারে! রূপোপজীবিনী আপন সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়ায়, ধর্মশীলা নারী তা গোপনে রাখে। একজন

আরব বলেন—ইয়োরোপের লোকেরা নিজেদের স্ত্রীকে মঞ্চে স্থাপন করেছে। ফলে অন্যরা তাদের নিয়ে যায়। তাজ্জব ব্যাপার এই, দোষ হয় তখন লুব্ধ প্রেমিকের, উদাসীন স্বামীর নয়! মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার আর একটি চলতি কথা ছিল—'ঘরের বিবিদের সঙ্গে আলোচনা অবশ্যই করবে, কিন্তু করবে কার্যতঃ ঠিক তার উল্টো। কেননা পবিত্র ডুমুরের ফুলও খুঁজে পাওয়া যায়, খুঁজে পাওয়া যাবে সাদা কাক এবং মাছের পায়ের ছাপও, কিন্তু রমণীর মনের খবর কেউ কোন দিন খুঁজে পাবে না।'

এই পটভূমিতেই হারেম। ফলে এখানে সন্দেহ আর ঈর্ষা সতত সাপের মত কিলবিল করে; বাদশাহের অলস মুহূর্তগুলো নানা দুঃস্বপ্নে ভরিয়ে তোলে, অক্ষম পৌরুষ নানা নারকীয় লীলায় তৃপ্তি খোঁজে। কত অসহায় নারীকে যে আত্মদান করতে হয়েছে একটি সন্দেহাতুর পুরুষের হাতে, তার হিসেব নেই। দূরের কিছু ঘটনা আমরা শুনেছি। হিন্দুস্থানেও এ জাতীয় হৃদয়বিদারক উপাখ্যান অনেক।

গ্রীষ্মের আজমীঢ়। প্রকাশ্য স্থানে বুক অবধি মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে একটি সুদর্শনা মেয়েকে। শুধু হাত দুটি তার মুক্ত। কি ব্যাপার? শোনা গেল মেয়েটি হারেমের বাঁদী। একটি খোজাকে ভালবেসেছিল সে। ওরা একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। অন্য খোজারাই ধরিয়ে দিল। হুকুম হল—খোজাকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারা হোক, আর মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায়ই পুঁতে রাখা হোক। তিন দিন দু-রাত্তির এভাবে থাকতে হবে তাকে। হিন্দুস্থানে তখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব। বাঁদীর মালিক স্বয়ং নূরজাহান। কাহিনীটা শুনিয়েছেন—টমাস রো, জাহাঙ্গীরের দরবারের ইংরেজ দূত।

আনারকলি, ফৈজি ইত্যাদির কাহিনী সুখ্যাত। সুখ্যাত শাজাহানের নিষ্ঠুর হাতে জাহানারার প্রেমিক-যুগলের ভাগ্য-

বিপর্যয়ের কাহিনীও। বার্নিয়ার-এর বিবরণ অনুযায়ী তাদের একজনকে শাজাহান হত্যা করেছিলেন আপন কন্যার সামনেই, গরম জলে সেদ্ধ করে। পিতার আগমন সংবাদ শুনে জাহানারা একটি ডেকচিতে লুকিয়ে রেখেছিল তাকে। শাজাহান আদেশ দিলেন—এই পাত্রেই জল গরম করা হোক, তোমার স্নান করা উচিত। অসহায় জাহানারাকে সায় দিতে হল। নিঃশব্দে প্রাণ দিল প্রেমিক। দ্বিতীয় তরুণটির নাম ছিল নাকি—নজর খাঁ। সুদর্শন সম্ভ্রান্ত। আদর করে শাজাহান একটি পান তুলে দিলেন তার হাতে। পানটি মুখে পুরে আনন্দিত তরুণ গিয়ে বসল আপন তাঞ্জামে। তাঞ্জাম যখন ঘরে পৌঁছেছে নজর খাঁ তখন মৃত।

ম্যানুসি অবশ্য বলেছেন—এসব কাহিনী সত্য নয়। একালের ঐতিহাসিকেরাও এগুলোকে বাতিল করে দিয়েছেন গুজব বলে। কিন্তু নিষ্ঠুরতা যে সেদিন অজ্ঞাত ছিল না হারেমে হারেমে, এ বিষয়ে ইতিহাসের মনে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, আতরের মত বিষেরও চল ছিল মুঘল হারেমে।

আতর আবিষ্কার করেছিলেন নূরজাহান। কেউ বলেন লাহোরের শালিমার বাগিচায়। কেউ বলেন দিল্লীতে। আরও অনেক আবিষ্কারের মতই এটা আকস্মিক ঘটনা। আদি তার গোলাপ জল! মুঘল হারেমে বিষের চর্চা শুরু করিয়েছিলেন নাকি আকবর। শিকার করতে গিয়ে একটি সাপ হত্যা করলেন সম্রাট। তারপর সেই তীরটিই নিক্ষেপ করলেন একটি হরিণকে লক্ষ্য করে। হরিণটি তৎক্ষণাৎ মরে গেল। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার মাংস অতি দ্রুত পচে যাচ্ছে। বাদশার মনে প্রশ্ন জাগল। সঙ্গীদের তিনি বললেন—ব্যাপারটার মীমাংসা চাই। ওরা সব শুনে সাপটিকে পরীক্ষা করল। বলল—জাঁহাপনা, এই সাপ দুর্লভ জাতের বিষধর। এর নিশ্বাসেও বিষ। আকবর হুকুম দিলেন—প্রাসাদে নিয়ে চল। সেখানে একটি কাঁচপাত্রে আরকে

ডুবিয়ে রাখা হল সাপটিকে, তৈরি হল মারাত্মক বিষ। ম্যানুসি লিখেছেন—মুঘলদের প্রাসাদে বিষ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চলত। বিষের ব্যবহারও ছিল ব্যাপক। আংটির তলায় বিষ, পানে বিষ—বিষ যেন হাতে হাতে ফেরে। অপ্রিয় অমাত্যকে সম্মানের ছলে তাকে যখন পাগড়ি কিংবা চোগা উপহার দেওয়া হত, অনেক সময় তাতেও বিষ মাখানো থাকত নাকি।

ম্যানুসি লিখেছেন—তিনি যখন হেকিম সেজেছেন তখন প্রায়শঃই নানা তরফ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসত বিষের জন্য। চাইতে আসতেন এমন কি আপন স্ত্রীর জন্যও। ম্যানুসি এমন একজন স্বামীর কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলতান মইজ্জুদীন। নিজের পত্নীকে আপন হাতে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন তরুণ শাহজাদা। বিদেশী চিকিৎসকের চেষ্টায় পর পর তিনবার মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছিল মেয়েটি। চতুর্থ বার পারেনি। হেকিম তখন রাজধানী থেকে অনেক দূরে—দাক্ষিণাত্যে।

নিষ্ঠুরতার আরও নানা কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায়। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবের জননী জনাব আউলিয়া বেগমের মহানুভবতার নানা কাহিনী শুনিয়েছে বাঁদী ইলুজান নাইটন সাহেবকে। ফাঁকে ফাঁকে নানা নিষ্ঠুরতার ইতিবৃত্তও আছে। একটির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘুমন্ত রূপসীর মুখ থেকে চিরকালের মত রূপ মুছে গিয়েছিল তাঁর নিপুণ, কুটিল হাতের স্পর্শে। শোনা যায়, তাঁর আমলেই লক্ষ্ণৌর কোন এক প্রাসাদের দেওয়ালে জীবন্ত কবরস্থ হয়েছিল আরও তিনটি মেয়ে। ওরা নাকি ব্যভিচারিণী ছিল। পরবর্তীকালে বৃদ্ধা বেগমের রাত্রির ঘুম কেড়ে নিয়েছিল ওরা। প্রাসাদে তিনি কঙ্কালের পদধ্বনি শুনতেন, নিশুতি রাতে দেওয়ালের আড়াল থেকে বিভীষিকার মত নাকি নেমে আসত ওরা, তাঁর কাছাকাছি ঘুরে বেড়াত।

তস্য পুত্র স্বনামধন্য ওয়াজিদ আলি সাহেব যা করেছেন তাও

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। ওয়াজিদ আলি তাঁর মায়ের এক প্রিয় বাঁদীকে কাছে টানতে চাইলেন। নবাব-জননী পুত্রের লালসা থেকে প্রিয় দাসীকে বাঁচাতে চাইলেন। তিনি বললেন, এ-মেয়ে অলক্ষুণে, এর মাথায় সর্প-চক্র আঁকা আছে। নবাব দেখেশুনে বললেন—তাইতো। হারেমের অন্য মেয়েদের তলব করা হল। বেগমরা সার বেঁধে দাঁড়ালেন। নবাব একে একে সকলের মাথা পরীক্ষা করলেন। মোল্লা এলেন, পণ্ডিত এলেন। আটজনের মাথায় এই 'সাম্পুন' বা সর্পচক্র পাওয়া গেল। পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন, তপ্ত লোহায় মস্তক শোধন আবশ্যক। যদি কেউ তাতে রাজী না হয় তবে তাকে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। ছ'জন প্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আজ ইতিহাসের নায়িকা। তিনি বেগম হজরতমহল। ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহে লক্ষ্ণৌয় তিনি ছিলেন ইংরাজের ত্রাস।

বাকি তু'জনকে সত্যিই আগুনে শুদ্ধ করা হয়েছিল।

হারেম যেন কান্নার আর এক নাম।

হারেমের কক্ষে কক্ষে যদি মৌন হাহাকার, হাহাকার তবে কক্ষের বাইরেও। অঙ্গনে, অলিন্দে, হামাম থেকে শুরু করে স্থলতানের শয়নকক্ষ, সর্বত্র ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে রাশি রাশি মানুষ। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়, 'খোজা' নামে এক আশ্চর্য, অদ্ভুত, বিকৃত অস্তিত্ব মাত্র।

শতকের পর শতক ধরে হারেমে হারেমে অবিশ্বাস্য অলঙ্কার এই খোজার দল। মধ্যপ্রাচ্য সম্প্রদায় হিসাবে সম্ভবত বরাবর তারা ছিল না। কারণ—পুরানো পৃথিবীতে আলো তখন কম ছিল সত্য, সভ্যতার চেহারাও ছিল অনুজ্জ্বল, কিন্তু সে পৃথিবীতে হারেম ছিল না। হারেমের আদি—ঐশ্বর্য, বল, আর শান্তি। এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর শর্ত শান্তি। যতক্ষণ না স্থির হয়ে বসতে পারছেন যোদ্ধা, ততদিন জীবনে তাঁর ভোগের অবসর নেই। শান্তির দিন যখন এল, প্রতিষ্ঠিত হল আপন প্রভুত্ব, তখনই শুরু হল মনের কোণে রকমারি বাসনার আনাগোনা। এল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এল হাজার রূপসী। এল হারেম, এবং তারই জের টেনে অবশেষে এল খোজা।

ঐতিহাসিকেরা বলেন—মানুষের হাতে গড়া ক্লীব মানুষ খোজা প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল মেসোপোটামিয়ায়। উপকথা বলে—

পুরুষকে প্রথম বিকলাঙ্গ করেছিলেন যিনি, তিনি একজন নারী। নাম তার সেমিরামিস। কেবলই উপকথার নায়িকা নন তিনি, খুঁজতে খুঁজতে হদিশ মিলেছে আসল মানুষটিরও ; খ্রীষ্টপূর্ব ৮১১ থেকে ৮০৮ অব্দ আসিরিয়ার রাণীমাতা ছিলেন এই নিষ্ঠুর রমণী। আসল নাম তাঁর—সামুরামাত।

'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এও উল্লেখ আছে খোজার। ধর্মীয় কারণে স্বেচ্ছায় আপন পুরুষত্ব বিসর্জন দেওয়ার রীতি প্রাচীন পৃথিবীতে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই চল ছিল। একজন খ্রীষ্টান যাজক ঘোষণা করেছিলেন—একমাত্র কামনাশূন্য খোজার সামনেই স্বর্গের দুয়ার খোলা। সর্ব কামনা-বাসনামুক্ত সাধকের জন্য অনেক স্বনামধন্য যাজক সওয়াল করে গিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছাবার তীব্র বাসনায় ওরিজেন নিজে আপন পুরুষত্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন !

ম্যাথুর প্রবচনেও খ্রীষ্টীয় খোজাদের উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন—একদল পুরুষত্বহীন মানুষ আছে, যারা মাতৃগর্ভ থেকে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর একদল আছে, যাদের অন্য মানুষ খোজায় পরিণত করেছে। তৃতীয় দলের খোজা যারা, তারা স্বর্গের কামনায় স্বেচ্ছায় পুরুষত্বহীন। ১৭৭২ সনে রাশিয়ায় একটি গোপন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লোকগোচরে এসেছিল, তাদের অনেকেই নাকি স্বেচ্ছায় খোজা সেজেছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস; ছিল—আদম এবং ইভ আদিতে অন্য রকম ছিলেন। পতনের পরেই নিষিদ্ধ ফল কেটে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের দেহে,—মানুষ জনক অথবা জননী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিল। এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা তাই বিকৃত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়। পুরুষেরা. অনেকেই খোজা হত, নারীরা আপন হাতে নিজেদের বুক কেটে ফেলে দিত।

খ্রীষ্টান জগতে খোজার সমাদর বৃদ্ধির পিছনে আর একটি কারণ—

তাদের কণ্ঠস্বর। একমাত্র খোজার কণ্ঠস্বরই নাকি বরাবর সমান তেজী, সমান গভীর, সমান নিখাদ। সিসটাইন চ্যাপেলে প্রার্থনা-গীত গাইবার জন্য স্বয়ং পোপ নিয়মিতভাবে নিযুক্ত করতেন তাদের। যদিও চতুর্দশ বেনেডিক্‌ট আপত্তি তুলেছিলেন, তবু এই প্রথা চালু ছিল ত্রয়োদশ লিও অবধি, অর্থাৎ ১৮৭৮ সন পর্যন্ত। ইতালীর অনেক বিখ্যাত গায়ক—নিকোলিনি গ্রিমাল্‌ডি, সেনেসিনো, ফারিনেলি—এবং আরও অনেকেই ছিলেন খোজা!

বলা নিস্প্রয়োজন, হারেমের খোজারা ঈশ্বরের নামে রিক্ত-পুরুষ নয়, তারা লোভাতুর, উদ্বিগ্ন, অক্ষম রাজা বাদশাহদের মনোবিকারের ফল মাত্র। মেসোপোটামিয়া থেকে সিরিয়া, সিরিয়া থেকে এশিয়া মাইনর, এশিয়া মাইনর থেকে ইউরোপ যদি ধর্মীয় খোজার ক্রম-ব্যাপ্তির পথ হয়, তবে তুর্কী হারেমে খোজা এসেছে অন্য পথে। আসিরিয়া থেকে তারা প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিল পারস্যে। পৃথিবীর এই তল্লাটে পারসিকরাই নাকি বন্দীদের প্রথম খোজা করেছিল হারেমে প্রহরী হিসেবে নিয়োগ করার জন্য। সাইরাস খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে ব্যাবিলন দখল করার পর আবিষ্কার করলেন, খোজার মত এমন নির্ভরযোগ্য পুরুষ আর হয় না। তাঁর যুক্তি: প্রথমত, খোজার নিজের সংসার বলে কিছু নেই। সুতরাং তাকে যে প্রতিপালন করবে, তার সুখে দুঃখে যে পাশে থাকবে, সে চিরকাল তার কাছে অনুগত থাকবে। দ্বিতীয়ত, খোজাদের অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষ ঘৃণা করে, ব্যঙ্গ করে, সুতরাং প্রভুর ভালবাসার মূল্য তার কাছে অপরিসীম। তৃতীয়ত, পুরুষত্ব নেই বলেই খোজারা দুর্বল, এমন নয়। ঘোড়াকে অস্ত্রোপচারের পর তার দৈহিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; ষাঁড়, কুকুর ইত্যাদির বেলায়ও একই পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। পরন্তু ওরা স্বভাবে কিঞ্চিৎ নম্র থাকে। ইত্যাদি।

সাইরাস অতএব তাদের দুয়ারে দুয়ারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হেরোডোটাস লিখেছেন—পারসিকরা আইওনিয়ানদের ধরে তাদের

পুরুষত্ব কেড়ে নিতে লাগল। তারপর সুন্দরী মেয়েদের মতই এদের নিয়ে চলল নিজেদের রাজার কাছে।

সৌখিনতা সংক্রমিত হল গ্রীস এবং রোমেও। গিবন লিখেছেন—ডেমিসিয়ান এবং নার্ভের নির্দেশে এবং কনস্টেনটাইনের সতর্কতার ফলে যে ব্যাধি এক সময় বন্দী ছিল তা-ই মুক্তি পেল পরবর্তীকালে, প্রাসাদে প্রাসাদে খোজার সংখ্যা বেড়েই চলল। কবি ক্লাউডিয়ান দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন খোজা ইউট্রোপিয়াসকে আক্রমণ করে। সে ধীরে ধীরে সম্রাট আর্কেডিয়াসের মনের প্রভু হয়ে উঠেছিল। কবি লিখছেন—পিতা হওয়ার যোগ্যতা নেই যার, স্বামী পরিচয় কোন দিন পাবে না যে, সে-ই কিনা এমন গর্বিত, এমন উদ্ধত।

প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের মধ্যেই ধীরে ধীরে পাকা হয়ে এল বন্দোবস্ত। লেভেন্ট-এ অনেক খোজা। তুর্কীরা অতএব অনায়াসেই হাত বাড়িয়ে মুঠো মুঠো খোজা পেয়ে গেল বাইজেনটাইন থেকে। তুর্কী সুলতানরা বরাবর এই আশ্চর্য প্রাণীটির ব্যবহার জানতেন না। প্রাসাদে তাঁরা খোজা আমদানি করেন প্রথম নাকি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। শিক্ষক বাইজেনটাইন শাসকেরা। তবে অচিরেই গুরু হয়ে দাঁড়ালেন তুর্কী সুলতানরা। তাঁদের ইতিহাসে তখন গৌরবের যুগ চলেছে। বুলগেরিয়া, ক্রোয়াসিয়া, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর, পারস্য—সর্বত্র তুর্কী বাহিনীর বিজয়-নিশান উড়ছে। রাজধানীতে আসছে অজস্র বন্দী। সুলতান প্রথম মাহমুদ এবং দ্বিতীয় মুরাদ তাদের কাজে লাগালেন। কিছু কিছু হতভাগ্য খোজা হয়ে নিযুক্ত হল প্রাসাদে।

এরা শ্বেতাঙ্গ খোজা। তুরস্কে নাম ছিল তাদের 'কাপু আগাসি'। হারেমে ছাড়পত্র ছিল না তাদের। কাজ ছিল প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে। 'কাপি আগা' বা প্রধান শ্বেতাঙ্গ খোজার দায়িত্ব ছিল—প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ বিধি-বন্দোবস্ত চালু রাখা। প্রাসাদের বিদ্যালয়টিও তার অধীন। শুধু তা-ই নয়, সমগ্র প্রাসাদ-রক্ষীবাহিনীর

শীর্ষে সে। সুলতানের কাছে কোন বার্তা, কোন দরখাস্ত বা প্রস্তাব পেশ করতে হলে তার মাধ্যমেই তা করতে হয়। এক কথায় সে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি, অনেক ক্ষমতা তার। দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ খোজাকে বলা হত—'হাজিনেদার বাসি'—সে ছিল রাজকোষের অধিপতি। প্রাসাদের হিসাবপত্র রাখা তার অন্যতম কাজ। তার কাছ থেকেই মাইনে নিতে হত প্রাসাদের গোলাম বাঁদীদের। তৃতীয় জনকে বলা হত—'কিলারজী বাসি'। তার কাজ ছিল সুলতানের হেঁসেলের তত্ত্বাবধান। রান্নাঘরের সমুদয় কর্মীরা তার অধীন। সুলতানকে কবে কী খাদ্য দেওয়া হবে তার নির্দেশ আসত তারই কাছ থেকে। হয়ত বা সে-ই ছিল সুলতানের খাদ্যের পরীক্ষক। বিষপ্রয়োগে প্রাণনাশের আশঙ্কা পদে পদে। ফলে কোন বাদশাহই পরখ না করিয়ে কোন খাদ্য মুখে তুলতেন না। কারও কারও রীতিমত নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা ছিল এজন্য। লক্ষ্ণৌর এক নবাব একাজে নিযুক্ত করেছিলেন একজন ইউরোপীয়ানকে। 'কিলারজী বাসি' নিজে খাদ্য-পরীক্ষক না হলেও, খাদ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত দায়িত্ব যে তারই ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চতুর্থ শ্বেত-খোজার পদবী—'সেরাই আগা'। সুলতানের অনুপস্থিতি কালে প্রাসাদের দৈনন্দিন জীবনকে চালু রাখা তার কাজ। তাছাড়া সে প্রাসাদের বিদ্যালয়টিরও পরিচালক। এছাড়াও সুলতানের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করবার জন্য নিযুক্ত হত একজন শ্বেতাঙ্গ খোজা। তার কাছেই থাকত সুলতানের শীলমোহরযুক্ত তিন আংটির একটি। প্রাসাদের মূল্যবান জিনিসপত্র যথাস্থানে আটকে রেখে শীলমোহরাঙ্কিত করা ছিল তার অন্যতম কাজ। সুলতানের টুকিটাকি ফরমাশও সে-ই পালন করত। তাকে বলা হত—'হস-ওদা-বাসি'।

বাদবাকী সব শ্বেতাঙ্গ খোজারা এই পঞ্চ খোজার অধীন, তাদের সহকারী কিংবা সাধারণ গোলাম মাত্র। কেউ কেউ তাদের রীতিমত পরিশ্রমের কাজ করত। সুলতানের দোলা-বাহকরাও বর্ণে শ্বেতাঙ্গ, পরিচয়ে খোজা।

প্রথম দিকে শ্বেতাঙ্গ খোজার সরবরাহে কোন গোলমাল ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, অটোমান সাম্রাজ্য তখন গৌরবের শীর্ষে। হাঙ্গেরিয়ান, স্লাভোনিয়ান, জার্মান তরুণ-তরুণী দলে দলে বন্দী করে আনা হত রাজধানীতে। মেয়েরা হারেমে নিক্ষিপ্ত হত, পুরুষদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মনোনয়ন করা হত খোজা করার জন্য। প্রথম দিকে সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিল না। কারণ, পুরুষের প্রয়োজনীয়তা তখন প্রাসাদের চেয়ে রণক্ষেত্রেই বেশি। দ্বিতীয়ত, তুর্কী সুলতানরা তখনও হারেমের নেশায় পুরোপুরি ডুবে যাননি, ধর্মীয় বিধিনিষেধ তখনও তাঁদের কাছে একেবারে মর্যাদা হারায়নি। বন্দীদের তখন খোজা করা হত কনস্টানটিনোপল-এর বাইরে। খাস প্রাসাদে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা চালু হয় নাকি সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে।

যুদ্ধবন্দী ছাড়াও দাস আসত খোলা বাজার থেকে, দাস-ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। ওরা 'কাঁচা মাল' সরবরাহ করত আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। নারী এবং পুরুষ—দুই পণ্যই ঝাঁকা ঝাঁকা আসত। তুর্কী ক্রেতারা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন—জর্জিয়ান রমণীর কোন তুলনা নেই। সুতরাং দেখতে দেখতে তার চাহিদা এবং সরবরাহ দুই-ই বেড়ে গেল,—ভাঁটা পড়ল পুরুষ আমদানিতে। উপস্থিত ইস্পাতের চেয়ে গোলাপই যে বেশি দরকারী।

অবশ্য শ্বেতাঙ্গ খোজার বাজারে এই মন্দার পিছনে আরও কিছু কারণ ছিল। এদের বশ মানানো কষ্টকর। দ্বিতীয়ত, দৈহিক এবং মানসিক গড়নে এরা তত সবল নয়, অনেকেই অস্ত্রোপচারের ধকল সইতে পারে না। তৃতীয়ত, এদের পুরোপুরি নির্ভর করাও যায় না। বিশেষতঃ হারেম রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে। সে তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য নিগ্রোরা। তারা সবল, সস্তা এবং অনুগত। সুতরাং, শুরু হল ব্যাপক হারে কৃষ্ণাঙ্গ দাস আমদানি। ব্যবসায়ীদের কল্যাণে আফ্রিকার উপজাতি-নায়কেরা অচিরেই জেনে গেলেন—

শত্রুকে হত্যা না, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই লাভ বেশি। দেখতে দেখতে জর্জিয়া এবং সিরকাসিয়ান শ্বেতাঙ্গ দাসের শূন্যস্থান দখল করে নিল মধ্য আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা। ক্রমে তুরস্কে কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের বিরাট বাজার গড়ে উঠল, হোয়াইট নীল-এর অববাহিকা শূন্য করে কৃষ্ণাঙ্গ দাসের দল চালান দেওয়া শুরু হল কনস্টানটিনোপল-এ। যারা এল তাদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সেই দাসেরা, যারা—খোজা।

হারেমে যদি কান্নাই ইতিবৃত্ত হয়, তবে খোজারা সেখানে তীব্র আর্তনাদ। স্বদেশের কিছু খবর বলি। ১৮৩৬ সনে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল সেখানে খোজা আছে ৬৩ জন। নাসিরউদ্দীনের আমলে (১৮২৭-৩৭) লক্ষ্ণৌর বেগম-মহলে খোজা ছিল ১৫১ জন। সংখ্যাটা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ। কিন্তু তার ভয়াবহতা বোঝা যায় একটি খবর শুনলে। মাত্র ক'বছর আগে, ১৯৫৬ সনে কার্ডিন্যাল ল্যাভিগেরাই মরক্কো থেকে ইউ এন ও'র সদর দফতরকে জানিয়েছিলেন—সুলতানের হারেমের জন্য সরকারী হাসপাতালে সম্প্রতি তিরিশটি শিশুকে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, কেউ তাদের বাঁচেনি। ইরাকের একজন চিকিৎসক জানিয়েছিলেন—খোজা করার জন্য সৌদি আরবের হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল কুড়িটি শিশুকে, তাদের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র দুটি।

সেকালের পশ্চিম এশিয়ায় বা আফ্রিকায় আজকের মত হাসপাতাল ছিল না ; যাদুকর, পুরোহিত আর হাতুড়ে ছাড়া চিকিৎসক ছিল না। সুতরাং একটি খোজা গড়তে গিয়ে কতজন মানুষের প্রাণ বিসর্জন দিতে হত, সহজেই তা অনুমান করা যায়। আরব দুনিয়ায় ডারকোর-এ একটি জেলার নাম—মেসেলাউমিয়া। সেখানে ছোট্ট একটি শহর—দিউয়াউসেস। শব্দটির অর্থ নাকি—খোজাগিরি। খোজা সরবরাহের জন্য খ্যাতি ছিল শহরটির। বছরে প্রায় তিন হাজার খোজা রপ্তানী হত সেখান থেকে, তার জন্য নাকি বিসর্জন দিতে হত তিরিশ হাজার বালকের প্রাণ।

আবিসিনিয়ার কুখ্যাত নরপতি জন-এর আমলে হিকস পাশার ইঙ্গ-মিশরীয় সৈন্যবাহিনী থেকে একশ' সুদানী সৈন্যকে ধরে খোজা বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল খার্তুমে। উপহারের সঙ্গে ছোট্ট একটি বার্তা,—মিশরের মহামান্য শাসক যদি কিছু মনে না করেন, তবে এই সামান্য ডালিটি গ্রহণ করতে পারেন। ওরা যখন ঠিকানায় পৌঁছেছে, একশ' সৈন্যের মধ্যে একজনও তখন জীবিত নেই! খোজা অতএব শুধু জীবন্ত হাহাকার নয়, প্রতিটি খোজার পিছনে অসংখ্যের বিলাপ।

তুর্কী হারেমে কৃষ্ণাঙ্গ খোজা এল। এল একই কান্নার পথ বেয়ে। তাদের মধ্যে প্রধান যে, তাকে বলা হয়—'কিস্‌লার আগা'। ধীরে ধীরে শ্বেতাঙ্গদের হঠিয়ে অন্দর এবং সদর—দুই তরফেরই প্রধান কর্মকর্তা হয়ে দাঁড়াল সে। সে শুধু হারেমের কুমারী দলের রক্ষীবাহিনীর প্রধান নয়, দরবারের নাজিরও,—যাবতীয় ওয়াকফ্ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক সে। পদমর্যাদায় সে 'পাশা'র সমান। নিজে সে দাস বটে, কিন্তু তার অধীনে বিস্তর গোলাম বাঁদী, তার নামে ঘোড়াশালে তিনশ' ঘোড়া। কি দিনে, কি রাত্রে—যে কোন সময় সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে সে। কেননা, রাজ্যের প্রধান উজির আর সুলতানের মধ্যে গোপন বার্তা আদান-প্রদান করাও তার দায়িত্ব। স্বভাবতঃই, শুধু হারেম কেন, পুরুষত্বহীন হয়েও সে সমগ্র অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যতম ক্ষমতাবান পুরুষ।

'কিসলার আগা'র পরেই হারেমে দ্বিতীয় ক্ষমতাবান খোজা 'হাজিনেদার আগা' বা প্রাসাদের খাজাঞ্চি। হারেমের যাবতীয় হিসাবপত্র রাখা তার কাজ। পদমর্যাদায় সেও একজন 'পাশা'র সমান। তৃতীয় মহাশয়-খোজা 'বাস্-মুসাহিব'। তার কাজ 'কিস্‌লার আগা' আর সুলতানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। তার অধীনে আট-দশ জন 'মুসাহিব' বা সহকারী আছে। দু'জন করে পালাক্রমে তারা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে; হারেম-প্রভু আর

হারেম-কর্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। তার পরে—পদমর্যাদায় উল্লেখযোগ্য 'ওদা লালা' বা কক্ষাদির পর্যবেক্ষক, 'বাস্-কাপি-ওগলান' বা বেগমদের কক্ষের প্রধান দ্বাররক্ষক প্রভৃতি। এদের পরেও ছিল অজস্র। কেউ স্নানঘরের তত্ত্বাবধায়ক, কেউ ছোটদের শিক্ষক, কারও দায়িত্ব সরবৎ, কারও বা অন্য কিছু। যে খোজা প্রমোদ কেন্দ্রে স্থলতানের পার্শ্বচর, তার পদবী ছিল—'দারুস সিয়াদেত'।

গৌরবের দিনে সব মিলিয়ে তুর্কী হারেমে ছয়শ' থেকে আটশ' খোজা। প্রথম প্রথম সংখ্যায় তারা এমন বিপুল ছিল না। ষোড়শ শতকে একজন দর্শক অনুমান করেছিলেন—সংখ্যায় বড় জোর ওরা জনা চল্লিশ। আর একজন বলেছিলেন—আরও কম, কিছুতেই এক কুড়ির বেশি নয়। সংখ্যাটা বাড়তে আরম্ভ করে সুলতান সুলেমানের আমলে, হারেমের আয়তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সুলেমানের অন্তঃপুরে বিবি ছিল তিনশ'! কুড়ি জন খোজার সাধ্য কি তাদের তদারক করে! তৃতীয় মুরাদের আমলে তিন গুণ বেড়ে গেল অন্তঃপুরের পরিধি, সেখানে তখন নানা বর্ণের, নানা দেশের বারো শ' রূপসীর কাকলি। সুতরাং, সপ্তদশ শতকের দর্শক গুণে দেখলেন, এক দরজাতেই মোতায়েন হয়েছে ত্রিশ জন খোজা। অন্য একজন হিসাব দাখিল করলেন—হারেমে সংখ্যা তাদের কমপক্ষে দু'শ। পরবর্তী ভ্রমণকারীরা মনে করেন সেটা সঠিক সংখ্যা নয়, এত বড় হারেম যথাযথভাবে শাসন করতে হলে অন্ততঃ তিন শ' থেকে পাঁচ শ' খোজা চাই।—নয় কি ?

খোজা আর খোজা। হারেমে গোলাপের ভিড়ে কীটের মত যেন কিলবিল করছে খোজা। সর্বত্র ওরা। শুধু গোসলখানার ভেতরে আর শয়নকক্ষের দুয়ারে নয়, অঙ্গনে প্রাঙ্গণে,—সর্বত্র খোজা। চেহারা সকলের সমান নয়। কেউ সুগঠিত সুপুরুষ, কেউ মোটা হয়ে গেছে অতিশয়, কেউ বা কুৎসিত। কিন্তু সকলেরই পরনে বাহারি

পোশাক, এবং অধিকাংশেরই পকেটে যথেষ্ট পয়সা। তুর্কী হারেমে নাকি হাত খরচ দেওয়া হত ওদের দৈনিক ৬০ থেকে ৮০ 'আস্‌প্রি'। 'আস্‌প্রি' তৎকালের তুর্কী মুদ্রা। প্রত্যেককে দুই প্রস্ত করে মূল্যবান রেশমী পোশাকও দেওয়া হত। এসব তুচ্ছ। খোজার আসল আয় ছিল—উপহার। বাদশা বেগম কে যে কখন কী গুঁজে দেবে হাতে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই অনেক খোজাই অতএব বলতে গেলে বিত্তবান ছিল।

'কিস্‌লার আগা'র মত উচ্চপদস্থ যারা তারা বিস্তর ভূ-সম্পত্তিরও মালিক ছিল। অবসর জীবন যাপন করার জন্য তারা অনেক সময় রাজধানী থেকে দূরে নিজের জন্য প্রাসাদ সাজাত। সুলতান আপত্তি করতেন না। কারণ খোজার কোন উত্তরাধিকারী নেই। তাছাড়া সুলতান শুধু আপন দাসের প্রভু নন, তার সম্পত্তিরও মালিক। সাধারণ খোজারা এত সুযোগ পেত না। হারেমে প্রবেশের পর সুলতানার বিশেষ অনুমতি ছাড়া তার দেওয়ালের বাইরে পা দেওয়ার কোন অধিকার নেই। কোন সাধারণ বেগম পীড়াপীড়ি করলেও তার পক্ষে হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ানো মানা। স্বর্গ অথবা নরক—হারেম যা-ই হোক, তা-ই তাদের অতঃপর শেষ ঠিকানা। অবশ্য ব্যতিক্রমও ঘটত। কিন্তু সাধারণ সামান্য খোজা গোপনে গোপনে অনেক অর্থ জমিয়ে ফেললেও স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত তার জীবনে স্বপ্ন হয়েই থাকত।

মনের মত নাম দেওয়া হত এদের। আমাদের দেশের মুঘল হারেমের কয়েকটি খোজার নাম—নাদির, দানিয়েল, দৌলত, মতলব, মার্জন, ইনায়েত, নেকনাম, দা'এম, উলফৎ, মেওয়া-ই-জান। শেষ তিনটি নামের অর্থ—'চিরকালের জন্য', 'বন্ধুত্ব' আর 'জীবনের ফল'। তুর্কী হারেমে প্রিয় ছিল নাকি ফুলের নামে নাম। নার্সিসাস, গোলাপ, করনেসন,—ইত্যাদি ফুলের প্রতি অনুরাগ দেখানো হত বেশি। একজন লেখকের বক্তব্য ঃ এর কারণ এরা

সবাই মেয়েদের সেবা-যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ করে, আর মেয়েরা ফুল ভালবাসে। তাছাড়া নামগুলো সতীত্ব, শুচিতা, সুগন্ধেরও প্রতীক।

একনিষ্ঠ হারেম-কন্যার মত সৎ খোজাও ছিল অবশ্য। ধর্মবান, বিবেকবান খোজা। ভারতের ইতিহাসেও তাদের কখনও কখনও দেখা মেলে। অযোধ্যার বিচক্ষণতম এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় আঞ্চলিক শাসক ছিলেন একজন খোজা। তবে স্বাধীন, সুখী খোজার মত বিবেকবান খোজাও সংখ্যায় অগুনতি নয়। এককালে এদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষকের অভিমত—অধিকাংশ খোজাই বদমেজাজী, বিষণ্ণ, বালসুলভ, প্রতিশোধপরায়ণ, নিষ্ঠুর এবং উদ্ধত। কারও কারও বক্তব্য: কেউ কেউ আবার স্বভাবে ঠিক এর উল্টো। তারা সরল, নিরীহ, আমোদপ্রিয়, উদার ইত্যাদি। গবেষকরা মনে করেন—কার স্বভাব কোন্ বাঁক নেবে সেটা অনেকখানি নির্ভর করে কাকে কখন অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তার উপর। শৈশবে অস্ত্রোপচারের ফল একরকম, সাবালকের ওপর অস্ত্রোপচার করলে তার ফল অন্যরকম।

তার কথা পরে। তার আগে বাহ্যিক পরিবর্তনগুলোও উল্লেখ করার মত। খোজার দেহ সম্পূর্ণ নির্লোম। তার কণ্ঠস্বর পুরোপুরি মেয়েলি। সে মেদভারে ক্রমেই আরও বিপুলদেহী। বয়স হলে তার চামড়ায় বিশ্রী ভাঁজ পড়ত নাকি। এছাড়া, সাধারণভাবে বলতে গেলে তার স্মৃতিশক্তি কম, দৃষ্টিশক্তি কম, ঘুম কম। অধিকাংশ খোজাই নাকি 'ঘুম-নেই' রোগে ভুগত: ওরা মদ্যপান করতে ভালবাসে না। মাংসের চেয়েও প্রিয় ওদের মিঠাই এবং কেক। ওদের প্রিয় রঙ—লাল। ওরা বাদ্যগীত ভালবাসে। বিশেষতঃ উচ্চ কর্কশ বাদ্য। ওরা পরিচ্ছন্ন থাকে। স্বভাবে ওরা কৃপণ। খোজারা গল্প-কাহিনী শুনতেও ভালবাসে, বিশেষতঃ পরীর গল্প। আর ভালবাসে—শিশুদের। অন্য প্রাণীর মধ্যে প্রিয়—গরু, ভেড়া, মুরগী,

বাঁদর এবং বিড়াল। অধিকাংশ খোজাই নিজের ছোট্ট ঘরটিতে কিছু না কিছু পোষে, আদর করে তাদের স্নান করায়, খেতে দেয়, মানুষের ভাষা শেখাবার চেষ্টা করে।

ওদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করত বেগম বাঁদীরা। কখনও কখনও খোজা তার ফলে রেগে উঠত। মনে একবার নালিশ জাগলে খোজাকে শান্ত করা শক্ত ব্যাপার, বছ. র পর বছর সে পুষে রাখে তার ক্ষোভ, অভিমান, কিংবা ক্রোধ। তারপর সুযোগ যেদিন আসে সেদিন নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিশোধ নেয়।

সম্রাট জারেকজেস-এর প্রিয় খোজা ছিল—হারমোটিমাস। হেরোডোটাস তার কাহিনী শুনিয়ে গেছেন। বাল্যকালে শত্রু এসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তারপর বিক্রি করে দিয়েছিল এক দাস-ব্যবসায়ীর কাছে। সে ব্যবসায়ীর নাম—পানিওনিয়াস। বালকটিকে খোজা করে সে বেচে দিল হাটে।

দিন যায়। ভাগ্যের ফেরে হারমোটিমাস ক্রমে জারেকজেস-এর বিশ্বস্ত সহচর। প্রভূত ক্ষমতা তার। এমন সময়ই ঘটনাচক্রে একদিন দেখা হয়ে গেল সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে। হারমোটিমাসের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু সে তা বুঝতে দিল না শত্রুকে। বন্ধুভাবে তাকে বলল—স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে চলে আস-না কেন আমাদের ওখানে,—সার্ডিসে। সুখে থাকবে। ধনেজনে আরও বেড়ে উঠবে। লোকটা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল।

ফাঁদে পড়েছে শিকার। এবার প্রতিশোধের পালা। সার্ডিসে অন্যতম প্রভাবশালী পুরুষ খোজা হারমোটিমাস। তার আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই কারও। একদিন পানিওনিয়াসও জানতে পারল তা। কথায় কথায়ই উঠল কথাটা। হারমোটিমাস প্রশ্ন করল তাকে—মনে পড়ে সেই বালকটিকে, যাকে একদিন নিজের হাতে খোজা করেছিলে তুমি? তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলে। আঁতকে উঠল পানিওনিয়াস।—হ্যাঁ, আমিই সেই বালক। গম্ভীর-

ভাবে আপন বক্তব্য প্রকাশ করল হারমোটিমাস।—আমার আদেশ, আপন হাতে নিজের পুত্রদেরও খোজা করতে হবে তোমাকে।

চারটি পুত্র ছিল দাস-ব্যবসায়ীর। নিজের হাতে চারজনেরই পুরুষত্ব কেড়ে নিতে হল তাকে। হারমোটিমাস-এর মনের আগুন তখনও নেভেনি। এরপর একদিন—পুত্রদের আদেশ দেওয়া হল,—পিতাকে খোজা করতে হবে! নিষ্ঠুর আদেশ। কিন্তু অমান্য করার উপায় নেই। খোজা কারিগর নিজেই এবার খোজা হল। হেরোডোটাস লিখেছেন—এভাবেই হারমোটিমাস তৃপ্ত করেছিল তার প্রতিশোধ-স্পৃহাকে।

এ কাহিনী নিষ্ঠুরতার। অন্য কাহিনীও আছে। নিজেদের কামনার বস্তুকে একান্তে ভোগ করার জন্য বিলাসী সুলতান বাদশাহরা কামনাশূন্য পুরুষবাহিনীকে মোতায়েন করেছিলেন নিজেদের অন্দরে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কি তাঁরা? হারেম-প্রভু সুলতান আর বাদশাহরা? বোধহয় না। কান পাতলে শোনা যাবে খোজার অট্টহাসিও।

জাহাঙ্গীরের আমলে খোজা আর বাঁদীর করুণ প্রেমোপাখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। বার্নিয়ার আর একটি ট্র্যাজেডি শুনিয়েছেন। দিদার খাঁ নামে এক খোজা ভালবেসেছিল এক হিন্দু কেরানীর বোনকে। খবরটা ক্রমে পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল। বিব্রত কেরানী বোনকে ডেকে একদিন সাবধান করে দিলেন। সাবধান করে দিলেন তিনি দুঃসাহসী প্রেমিক দিদারকেও। কিন্তু ভালবাসা কোন বাধাই মানতে চায় না। খোজার ভালবাসা আরও অবোধ, আরও বেপরোয়া। দিদার খাঁ তবুও পালিয়ে পালিয়ে অভিসারে আসে। একদিন অসময়ে হঠাৎ ঘরে ফিরে এলেন কেরানী। ঢুকেই তিনি বিমূঢ়। একই শয্যায় শুয়ে আছে প্রেমিক-প্রেমিকা, দু'জনেই ঘুমন্ত। দপ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। কেবল কলম নয়, কেরানীর ঘরে তলোয়ারও থাকত তৎকালে। ক্ষুব্ধ কেরানী দেওয়াল

থেকে সেটি হাতে তুলে নিলেন, তারপর এক ঘায়ে একই সঙ্গে দু'জনের শিরচ্ছেদ করে বসলেন। হত্যাকাণ্ড। সুতরাং কোতোয়াল এসে ধরে নিয়ে গেল তাকে বাদশাহের কাছে। আউরঙ্গজেব মনোযোগ সহকারে সব শুনলেন। কিন্তু কেরানীকে শাস্তি দিলেন না। বাদশাহ বললেন—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই তুমি মুক্ত।

অনেক দিদার নিশ্চয় প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সফলও হয়েছে অনেকে, কামনা সকলেরই অতৃপ্ত থাকেনি চিরকাল। সুলতানদের সতর্কতার অন্ত ছিল না। নানা ধরনের ক্লীব তৈরি করেছিলেন তাঁরা। সম্ভাব্য সব প্রক্রিয়াই অবলম্বন করা হয়েছিল হারেমের পবিত্রতা রক্ষার জন্য। তারই মধ্যে, ইতিহাস বলে, আপাত অক্ষম খোজা ক্ষণে ক্ষণে বিজয়ী পুরুষ, তার তৃপ্ত জীবনের পাশে বাদশাহ এক দুর্বল, অসহায় অস্তিত্ব।

নানা ধরনের খোজা ছিল।—'কাস্ট্রাটি', 'স্পাডোনিস', 'থলিবি'। আরব্য উপন্যাসে বার্টন আরও তিন ধরনের খোজার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধারণা, এত সব করার পরও বলা চলে না—খোজা পুরুষ হিসাবে পুরোপুরি অক্ষম। তিনি একজন বিবাহিত খোজার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সে জানিয়েছিল, কিঞ্চিৎ বিকৃত উপায় বটে, কিন্তু দম্পতি হিসাবে ওরা তৃপ্ত এবং সুখী।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটি পাণ্ডুলিপি আছে। রচনা কাল ১৬৯৯-১৭০০ খৃঃ। লেখক জনৈক জে রিচার্ড। তিনি খোজার যৌন-জীবন সম্পর্কে লিখেছেন—"It is credibly reported that they have commerce in a manner unknown to us, and it is no great matter, may even women amongst themselves have ways of supplying the Defect of men etc." অর্থাৎ, স্বাভাবিক নরনারীর মত না হলেও খোজার যৌন জীবন ছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলেন—অস্বাভাবিক মানুষ গড়তে গিয়ে নিজেদের

অজ্ঞান্তে অনেক সময় সত্যিই অস্বাভাবিক মানুষ গড়ে ফেলেছিলেন সেদিনের সুলতান বাদশাহরা। রোমান লেখক মারসিয়াল ব্যঙ্গচ্ছলে বন্ধুকে বলেছেন—পানিকাস, তুমি জানতে চাও তোমার সিলিয়া কেন খোজাদের নামে এমন পাগল হয়ে ওঠে? কারণ আর কিছু নয়, সিলিয়া বিবাহিত জীবনের ফুল চায়—ফল নয়।

আর এক রোমান লেখক জুভেনাল লিখেছেন: অনেক মেয়েই খোজাদের নরম দেহ আর চুম্বনের জন্য পাগল। একটা কারণ—ওদের গোঁফ দাড়ি নেই। দ্বিতীয় কারণ—খোজার সঙ্গে সহবাস করলে ভ্রূণ-হত্যার দুশ্চিন্তা নেই।

খোজা সম্পর্কে তিনি লিখছেন—"Made a eunuch by his mistress, conspicuous from afar, he enters the bath the cynosure of all eyes, and vies with the guardian of our vines and gardens. Let him lie with his mistress, but, Postumus, trust not your Bromius…" অস্যার্থ,—খোজাকে বিবিরা স্নানঘরেও নিয়ে যেতে পাবে, কেউ আপত্তি করে না। কিন্তু মনে রেখো, ওদের বিশ্বাস নেই।

হঠাৎ নাকি জেগে ওঠে ওদের কামনার আগুন। সে খোজা ঝড়ের সমুদ্রের মত,—তার মত পুরুষ নাকি আর হয় না। কোন কোন খোজার পিতা হওয়ার ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু সে গৌরব অর্জন করতে পারত সে একমাত্র কোন বিকৃত উপায়েই। সুতরাং, তার তত চাহিদা ছিল না। সবচেয়ে প্রিয় ছিল আপাত শান্ত, দৃশ্যত কুৎসিত, লুক্কায়িত আগ্নেয়গিরির মত সাধারণ খোজা। সুলতানরা সে আগুনের কোন খবরই রাখতেন না এমন নয়। মাঝে মাঝে হারেমের খোজাদের তলব পড়ত হেকিমের ঘরে। নতুন করে পরীক্ষা করে দেখা হত ওদের। কখনও কখনও নতুন করে অস্ত্রোপচারও করা হত। একজন চৈনিক খোজার কাহিনী আছে হারেমের ইতিহাসে। চিয়েন লুঙ-এর (১৭৩৬-৯৬) আমলে পিকিংয়ের

হারেমে ছিল সে। বেচারা একদিন ধর্মীয় নেতার কাছে অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিল, বলেছিল—খোজার ওপর কোন পুরোহিতের এক্তিয়ার নেই, সে সব রীতিনীতি বহির্ভূত। ক্ষুব্ধ পুরোহিত নালিশ করলেন সম্রাটের কাছে, বললেন—আমার মনে হয় এত উদ্ধত যে, নিশ্চয় তার পুরুষত্ব আছে। গোপনে গে পনে হয়ত বা সে হারেমের রমণীদেরও উপভোগ করছে! সম্রাটের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক পাঠানো হল। পরীক্ষা করে দেখা গেল, সত্যিই তাই, আবার পৌরুষ ফিরে পেয়েছে খোজা। সুতরাং আবার অস্ত্রোপচার করা হল ওকে। এবার আর ধকল সইতে পারল না বেচারা। সে মারা গেল।

বেঁচে থাকত যারা, তারা অনেক সময়ই সুখী পুরুষ। যথা 'আরব্য উপন্যাসের' আবিসিনিয়ান খোজা বখিয়েৎ। তার জবানবন্দী শোনার মত ঃ

আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। এক দাস-ব্যবসায়ী আমাকে দূর দেশে নিয়ে চলল। সেখানে আমি নিলামে বিক্রি হয়ে গেলাম জনৈক ওমরাহের কাছে। আমার মালিকের ঘরে একটিই মাত্র কন্যা। তার বয়স তিন বছর। খুবই সুন্দরী সে। আমরা দু'জন একসঙ্গে খেলি, গান গাই, গল্প করি। এমনি করে দিন এগিয়ে চলল। নিজের ঘরের কথা ক্রমে আবছা হয়ে এল মনে। দু'জনেই একসঙ্গে বড় হয়ে উঠলাম আমরা।

একদিন এমনিতেই আমি তার ঘরে ঢুকেছি, কোন কাজ ছিল না,—মিছিমিছিই যাওয়া। ওর কাছাকাছি থাকতে ভাল লাগে আমার। গিয়ে দেখি সে বসে আছে। নিঃসঙ্গ, উদাসীন। আমাকে দেখেও মুখে তার কোন কথা নেই। দেখে মনে হলো সবে সে হামাম থেকে স্নান করে এসেছে। গা দিয়ে সুগন্ধ বের হচ্ছে, মুখখানা সদ্য ওঠা চাঁদের মত ঠেকছে। সে ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকল। ক্রমে বরাবরের মতই হাসাহাসি, হুড়োহুড়িতে মেতে উঠলাম আমরা।

হঠাৎ কী যে ঘটে গেল। নতুন খেলা শুরু হয়ে গেল। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। পাগল হয়ে গেল নাকি মেয়েটি? সে প্রশ্ন ভাববার তখন সময় নেই। আমিও যেন উন্মাদ।

জ্ঞান যখন ফিরল ভয়ে তখন আমার শরীর হিম। কোনদিকে না তাকিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম আমি। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকেছিলেন নাকি ওর মা। বুঝতে তাঁর কিছুই বাকি ছিল না। তবে বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি, স্বামীকে কিছু বলেননি।

দু'মাস পরে প্রভুপত্নী লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে এক তরুণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। স্বামী তখন বাড়ি ছিলেন না। বুদ্ধিমতী রমণী একটি কবুতর কেটে মেয়ের শয্যায় রক্ত ছিটিয়ে রাখলেন। ভাবখানা এই, স্বামী বাড়ি ফিরে এলে কেঁদে কেঁদে এই রক্ত দেখিয়ে তাঁকে তিনি বোঝাবেন যে, মেয়ে খুন হয়ে গেছে।

এরপর আমার পালা। আমাকে তিনি জোব করে বেঁধে খোজা করে দিলেন। মেয়েটির স্বামীও হাজির ছিল সেই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে। সে বলল—ভালই হল, তুমি হবে আমার দুলহনের আগা।

আমি রাজী হয়ে গেলাম।

আমি এখন ওদের ঘরেই থাকি। স্বামী জানে আমি খোজা। কিন্তু আমরা দু'জনে জানি—আমরা কত সুখী। আসলে আমিই যেন ওর জীবনে সর্বস্ব, ওর সখা, স্বামী, আনন্দ।

ওর মৃত্যুদিন পর্যন্ত কেউ জানতেই পারেনি কী স্বর্গসুখ ভোগ করেছি আমরা। হঠাৎ সে বিদায় নিল। এরপর আর এ বাড়িতে থাকার কোন অর্থ হয় না। আমি চলে গেলাম সুলতানের খাজাঞ্চি-খানায়। তারপর সেখান থেকেও একদিন পালিয়ে গেলাম আমার ভালবাসার ধন যেখানে গিয়েছে সেখানে,—বেহস্তে। আমরা দু'জনে এখন সেখানেই আছি। ওরা আমাকে খোজা করেছিল বলেই না জীবনে মরণে এত সুখ পেলাম আমি!

সব সময় এ সুখ খোজার আয়ত্তে ছিল না। অথচ মনে তার

তীব্র বাসনা। হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য সে খোজা তখন উন্মাদ। লুপ্ত পৌরুষ উদ্ধারের জন্য এমন কোন মূল্য নেই যা সে দিতে রাজী নয়। জনৈক চৈনিক খোজাকে কে নাকি বলেছিল—এরও দাওয়াই আছে বইকি, তবে ব্যাপারটা একটু কষ্টসাধ্য। পারবে সাতজন মানুষের মগজ খেতে? যদি পার, তবে আবার ফিরে আসবে হারানো বল। তাই নাকি করেছিল লোকটি। সাত জন কয়েদীকে খুন করে তাদের মগজ খেয়েছিল। তাতে সে বাঞ্ছিত ফল পেয়েছিল কিনা সে কথার উল্লেখ নেই ইতিহাসে।

যে-কোন ভাবেই হোক, অনেক খোজাই লুপ্ত পৌরুষ ফিরে পেত। কিংবা আদৌ হারাত না,—নিজের অজ্ঞাতে চাপা পড়ে থাকত মাত্র। একজন গর্বিত খোজার জবানবন্দী :

ভাগ্যের দাস আমি। নিশ্চয়ই আমি জিন্-এর সন্তান। আমার একমাত্র উপাস্য নারী। আল্লা মানুষকে সম্পূর্ণ করে তৈরি করেছেন। তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পিছনে উদ্দেশ্য আছে, সব কিছুরই কোন না কোন ব্যবহার আছে। শয়তান দাস-ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে আমি রিক্ত, আমি আর সম্পূর্ণ মানুষ নই। কিন্তু তাতে আজ আর আমার বিন্দুমাত্র খেদ নেই। আমার কোন সন্তান নেই। কোনদিনই বলতে পারব না আমি কারও পিতা। কিন্তু হাজার রমণী মনে মনে জানে আমি তাদের তৃপ্তি দিয়েছিলাম।

তুর্কী হারেমের জনৈক খোজার স্বীকারোক্তি :

কামনা আমার কোনদিনই লুপ্ত হয়নি। বরং হারেমে এসে তা আরও বেড়ে গেল। চারদিকে হাজার ভোগের সামগ্রী। আমাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই যেন ওরা দিন-রাত্তির ঘুরে বেড়ায় আমার সামনে। প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করি—আমি রিক্ত। রাত্রে সুলতানের শয্যাগৃহে বেগমকে যখন পৌছে দিতে যাই, তখন মনে মনে আমি কামনার আগুনে পুড়ে মরি।

অঘটন ঘটল হঠাৎ একদিন। একদিন স্নানের ঘরে এক রূপসীর

অঙ্গ মার্জনা করতে করতে হঠাৎ যেন কী ঘটে গেল আমার দেহে। আগ্নেয়গিরিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ, শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ ঝড়। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। একটি নারী আর আমি—এছাড়া এই ছুনিয়ায় যেন আর কেউ নেই, কিছু নেই। আর সব যাছুবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে, উধাও হয়ে গেছে। কোথায় সুলতান, কোথায় বা 'কাপু আগাসি',—শুধু আমি আর একটি নারী।

আমি তখন আতঙ্কে কাঁপছি। মনে মনে নিজেকে বললাম—পৃথিবীতে তোমার দিন ফুরোল। কিন্তু আশ্চর্য, যা ভেবেছিলাম অনিবার্য, তা কিন্তু ঘটল না। মেয়েটি সব কথা গোপন রেখেছিল। শুধু বিদায় দেওয়ার সময় হাত ধরে বলেছিল—আবার দেখা হবে নিশ্চয়।

দেখা হয়েছিল। আরও একবার নয়, অনেক, অনেক বার। ওর মুখ বন্ধ রাখার জন্য বরাবর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছিলাম আমি। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেই মাঝে মাঝে খুশী করতে হত ওকে।

শুধু কি একটি অতৃপ্ত নারীকেই? সম্ভবত নয়। আরব ছুনিয়ায় একটি প্রচলিত প্রবাদ—মেয়েরা যখন স্নানের ঘরে, শয়তান তখন তার সঙ্গে। হারেমের হামামে শয়তান তখন খোজা।
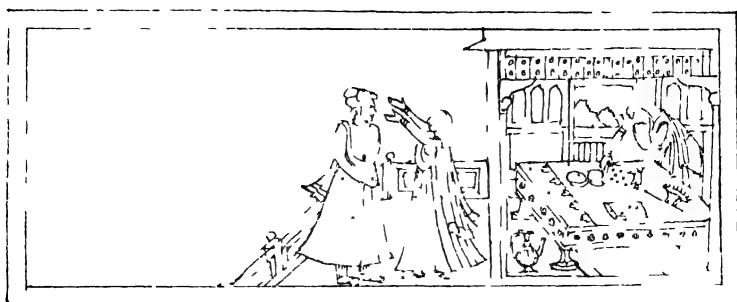
হারেমের আর এক অভিনব আয়োজন এই হামাম। হামাম মানে স্নানঘর। মুঘল হারেমে সুন্দরীদের অবগাহনের জন্য যমুনার টলটলে নীল জল বয়ে আনা হত অন্দরে। রূপসীরা সেই স্বচ্ছ জলে মরালীর মত ভাসতেন, ডুব দিতেন, আবার ভাসতেন, জল ছিটিয়ে খেলা করতেন। মাঝে মাঝে বাদশাহ নিজেও নাকি যোগ দিতেন সে জলকেলিতে। বস্ত্র হরণ অভিনীত হত, কখনও বা নৌকাবিলাস। এ ব্যাপারেও কিন্তু মুঘল হারেম হার মানে তুর্কী হারেমের কাছে। বসফরাসের জলে লেখা তুরস্ক সম্রাটদের সে বিলাস-কাহিনী। কেউ কোন দিন পুরোপুরি জানবে না; মারবেল পাথরের ঘর আর অলঙ্কৃত ফোয়ারাগুলোয় সেদিনের সৌখিনতার আভাসটুকুই পাওয়া যেতে পারে মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে একবার তাকানো যাক সুলতানের স্নানঘরটির দিকে :

একদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ সুযোগ মিলে গেল সুলতানের স্নানঘরে উঁকি দেওয়ার। পৃথিবীতে এমন সুন্দর স্নানঘর আর দ্বিতীয়টি নেই। কক্ষের চারদিকে ভৃত্যদের জন্য বন্দোবস্ত, মাঝখানে

সুলতানের জন্য স্নানের আয়োজন। চারদিকে ফোয়ারা আর জলাধার। জলের নলগুলো সব সোনা আর রুপোয় গড়া। পাত্রগুলোও রৌপ্যমণ্ডিত, স্বুবর্ণখচিত। কোন কোন পাত্রে একই সঙ্গে শীতল ও গরম জল আসছে। মেঝে দামী পাথরে মোড়া। তার দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কষ্টকর। দেওয়ালে গোলাপ এবং রকমারি সুগন্ধের উৎস।···কক্ষে আলো জ্বলছে। জানালার কাচে প্রতিফলিত হয়ে সে আলো আরও উজ্জ্বল। দেওয়ালগুলো শুকনো, বাতাস নাতিশীতোষ্ণ।···পাশেই কাপড় ছাড়ার ঘর। গোটা কক্ষটি উজ্জ্বল মারবেল পাথরে ঢাকা। বসবার আসনগুলো স্বর্ণ এবং রৌপ্যখচিত।···

প্রাণহীন ঐশ্বর্যের বিবরণ। এই বিবরণটি লিখেছিলেন ইভলিয়া এফেনদি। রচনাকাল ১৬৩৫ সন। তুরস্কের সিংহাসনে তখন অধিষ্ঠিত চতুর্থ মুরাদ। তাঁর স্নানঘরের একটি বিবরণ রেখে গেছেন ট্যাভারনিয়ার-ও। তিনিও পাথর, কাচ আর ফোয়ারার গোলক-ধাঁধায় হারিয়ে গেছেন যেন। তাঁর দীর্ঘ বিবরণ থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তা হচ্ছেঃ স্নানের ঘরের সঙ্গেই ছিল ক্ষৌরকারের বসবার ঘর। দ্বিতীয়ত, সুলতান ভেতরে ঢুকলে বাইরে থেকে তাঁকে দেখা যেত না বটে, কিন্তু এমন একটি জানালা ছিল যেখানে দাঁড়ালে তিনি নীচের বাগান এবং দূরের সমুদ্র দেখতে পেতেন।

কথায়ই বলে—'টার্কিশ বাথ'। স্নানের ব্যাপারে তুর্কী রুচি বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন—এই তুর্কী স্নানঘর আসলে বাইজেনটাইন স্নানঘরেরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ মাত্র। অবশ্য বাই-জেনটাইন সম্রাটরাও এই স্নানঘরের আবিষ্কর্তা নন, তাঁরাও তা পেয়েছেন নাকি গ্রীকদের কাছ থেকে। সেদিক থেকে তুর্কী স্নানঘর পূর্ব আর পশ্চিমের এক স্মরণীয় সমন্বয়। একজন ঐতিহাসিক বলেন—"Rome was indebted to her strigil as wel. as to her sword for the conquest of the world". রোম এই তুরস্কের

কাছ থেকেই পেয়েছিল তার প্রখ্যাত বারোয়ারী স্নানঘরের ধারণা, আর পেয়েছিল নতুন ধরনের তলোয়ার। তুরস্ক সেদিক থেকে পশ্চিমের শিক্ষকও বটে। অনেক ঐতিহাসিক স্নানঘরের অবশেষ এখনও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় দেশের এখানে ওখানে। তার একটির সঙ্গে নাকি জড়িয়ে আছে হারকিউলিস-এর স্মৃতি, অন্য একটিতে নাকি স্নানার্থী সেজে আসতেন স্বয়ং ভেনাস!

উপকথাকে বিদায় দিয়ে আবার ফিরে আসা যাক সুলতানের প্রাসাদে। একজন গবেষক হিসাব করেছেন, কমপক্ষে ত্রিশটি হামাম ছিল এক সময় তুরস্কের সুলতানের অন্দরে। তার জল গরম করা হত তাম্রপাত্রে, কাঠের আগুনে। এসব বন্দোবস্ত থাকত মেঝের নীচে একটি কক্ষে। নল বেয়ে ঠাণ্ডা এবং গরম জল আসত স্নান-ঘরের ফোয়ারায় আর কলে। প্রত্যেক স্নানঘরের সঙ্গে সঙ্গে থাকত তিনটি প্রধান কক্ষ। ঠাণ্ডিঘর, গরমঘর, বিশ্রামঘর। এ ছাড়াও নানা ব্যবহারের জন্য টুকিটাকি আরও ঘর। সুলতানের স্নানঘরের উল্টোদিকে সুলতানার স্নানঘর। এই দুই ঘরেই এসে মিলিত হতেন 'হারেমলিক' আর 'সেলামলিক'-এর বাসিন্দারা। সুলতানের স্নানঘরের নাম—'হুনকর হামানি'। সুলতানার স্নানঘর থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে 'হুনকর সোফাসি' বা সুলতানের খাস কামরার দিকে। সুলতানাদের স্নানঘরে উঁকি দেওয়ার জন্যই কি এই সুলতানী বন্দোবস্ত?

সে প্রশ্নের উত্তর পরে। তার আগে বেগমদের স্নানের ঘরটি একবার দেখে নেওয়া যাক। স্থাপত্যের বর্ণনা এখানে অবান্তর। তার চেয়ে সত্যিকারের স্নানের খবর সংগ্রহ করতে পারলেই ভাল। সাধ থাকলেও সে সাধ্য কারও নেই। সব দর্শকই, অতএব, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছেন। অর্থাৎ শহরের মেয়েদের স্নানের ঘর দেখেই মনে মনে কল্পনা করেছেন হারেমের হামামগুলোকে। সেখানকার খবরও কিছু কিছু দিতে পারেন একমাত্র মহিলা অভিযাত্রীরাই।

মোটামুটি তাঁরা সবাই একালের দর্শক। তাঁদের একজন তুর্কী মেয়েদের স্নানঘরের বিবরণ দিচ্ছেন ঃ

প্রথম সারির আসনগুলো গদিওয়ালা, মূল্যবান কার্পেটে মোড়া। তাতে বসে আছেন মান্য মহিলারা। দ্বিতীয় সারিতে তাঁদের পিছনে উপবিষ্ট ক্রীতদাসীরা। পোশাক বা মর্যাদায় বেগম আর বাঁদীতে, সুলতানা আর দাসীতে কোন পার্থক্য নেই, সকলেই আদিম প্রাকৃতিক সজ্জায় সজ্জিত, সহজ ভাষায় বললে—সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। রূপ কিংবা কুরূপ, কারও অঙ্গের কোন অংশই গোপন নেই। তবু ঠোঁটের হাসিতে কিংবা চোখের দৃষ্টিতে কোন বাসনার ইঙ্গিত নেই কারও। মিলটন বর্ণিত মাতৃমূর্তির মতই স্বচ্ছন্দে রাজকীয় গরিমায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওঁরা। কারও কারও দেহের গড়ন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গড়া প্রতিমার মত সুঠাম। অধিকাংশেরই গায়ের রঙ ঝকঝকে সাদা। মাথায় বিনুনি বাঁধা চুল নেমে এসেছে ঘাড়ে, তার অন্তে হীরকখচিত ফিতে বাঁধা।···এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, যদি বস্ত্রমুক্ত থাকাই ফ্যাশান হত তাহলে মানুষ কদাচিৎ কোন রূপবতীর মুখের দিকে তাকাতো। শ্রী শুধু মুখে নয়, অন্যত্রও আছে। অন্ততঃ এই স্নানঘরে এসে দাঁড়ালে তা-ই মনে হয়।

আমি দেখছিলাম, যাদের অঙ্গে এত ঢল ঢল রূপ, এমন সুডৌল যাদের দেহ, তাদের অনেকেরই মুখ কিন্তু অনুপাতে তত সুশ্রী নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলছিল। মনে হচ্ছিল, আমাদের আইরিশ চিত্রকর মিঃ জারভিস অদৃশ্য হয়ে এখানে একবার এসে হাজির হলে পারতেন। চারদিকে এতগুলো রূপবতী, লাবণ্যময়ী, নগ্নদেহী রমণী নানা ভঙ্গিমায় ছড়িয়ে আছে; কেউ কথা বলছে, কেউ কাজ করছে, কেউ কফি কিংবা সরবৎ খাচ্ছে, কেউ বা আলস্যভরে শরীর এলিয়ে বসে আছে আপন আসনে—শিল্পীর পক্ষে আপন বিদ্যাচর্চার এমন সুযোগ বোধহয় কখনই আসে না। বাঁদীরা পর্যন্ত রীতিমত

সুদর্শনা। তারা নানা ছন্দে, নানা ঢঙে বিবিদের চুল বাঁধছে। আলোচিত হচ্ছে অন্দর আর সদরের নানা সংবাদ, নানা গুজব। হামামে পরচর্চার মত উপাদেয় আর কিছু নেই।...

এই বিবরণটির লেখিকা লেডি মারি ওরটলি মণ্টেগু। রচনা কাল—১৭১৭ সন। তার একশ' কুড়ি বছর পরে মিস পার্ডো নামে আর একজন পশ্চিমী বিবি তুর্কী হামামের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

ঘরে ঢুকেই আমি বিস্ময়বিহ্বল। গন্ধকের গন্ধপূর্ণ গুমোট আবহাওয়া, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় যেন। ক্রীতদাসদের চীৎকার গম্বুজের ছাদে, দেওয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। তাতে যেন পাথর পর্যন্ত জেগে উঠতে চায়। তারই মধ্যে খিল খিল হাসি, চাপা গলায় কথাবার্তা। প্রায় তিনশ' রমণী একসঙ্গে স্নান করছে। অধিকাংশের অঙ্গেই বস্ত্র নামমাত্র। সে বস্ত্রখণ্ডটিও অতিশয় সূক্ষ্ম এবং আর্দ্র, ফলে দেহের কোন অংশই আর গোপন নেই।...ব্যস্ত ক্রীতদাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোমরের ওপর থেকে তাদের দেহও বস্ত্রভার-মুক্ত। মাথায় স্তূপীকৃত তোয়ালে। সুরূপা, হাস্যময়ী, লাস্যময়ী ক্রীতদাসীর দল। কেউ মিষ্টি খাচ্ছে, কেউ সরবৎ পান করছে, কেউ বা গল্প করছে। শিশুরা সবকিছু ভুলে আপন মনে খেলা করছে। হঠাৎ সবকিছু ছাপিয়ে উদ্দাম কণ্ঠে তুর্কী সঙ্গীত। বিশ্বাস হয় না, আমি এই পৃথিবীরই কোথাও আছি।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে অবশেষে এল ওরা বাইরের হল-ঘরে। নিমেষে সোফায় সোফায় বসে গেল সুন্দরীর দল। দাসরা শুকনো তোয়ালে খুলে দিচ্ছে তাদের। দাসীরা মাথায় গন্ধতৈল মাখিয়ে দিচ্ছে। তারপর মসলিনের রুমালে ঢেকে দিচ্ছে ভেজা কেশগুচ্ছ। আতর ছিটানো হচ্ছে সর্বাঙ্গে। তারপর এক-একটি আচ্ছাদনে গা ঢেকে তারা এলিয়ে পড়ছে আসনে,—কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে সমস্ত হলটাই যেন একটা মেলায় পরিণত হয়েছে। মিঠাই, সরবৎ, ফল—বিক্রি হচ্ছে। নিগ্রো

Temple de Ste Sophie
Entrée du Serrail
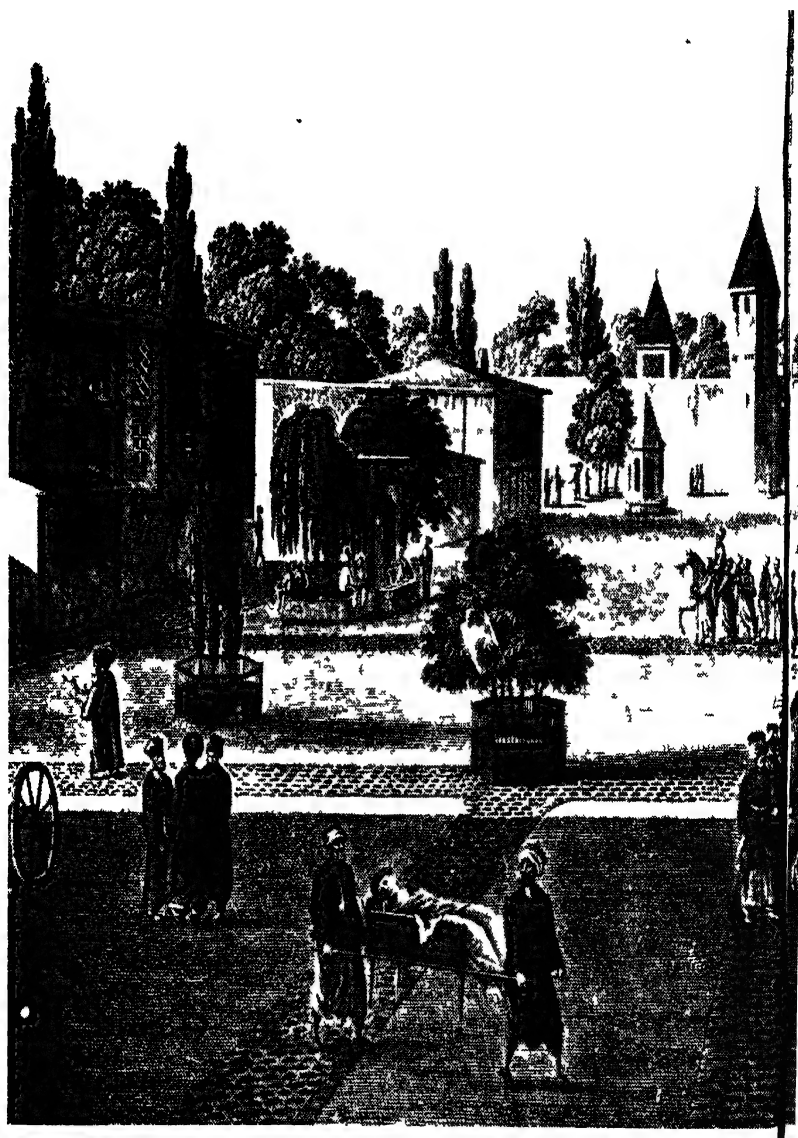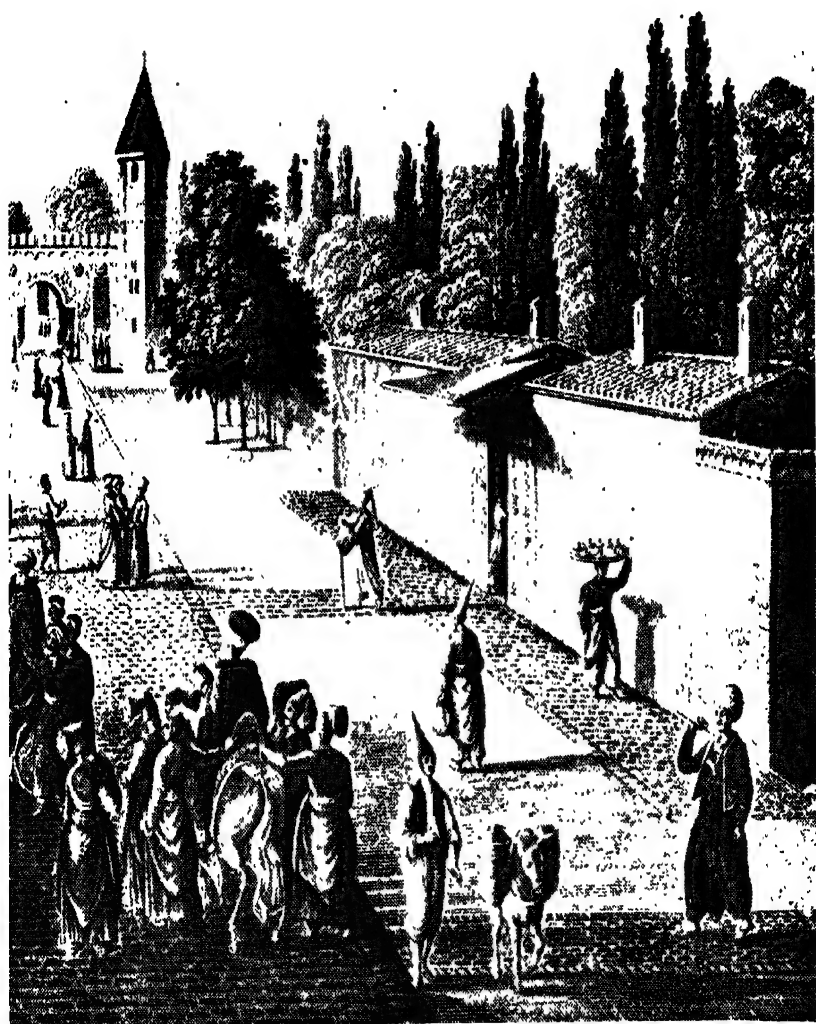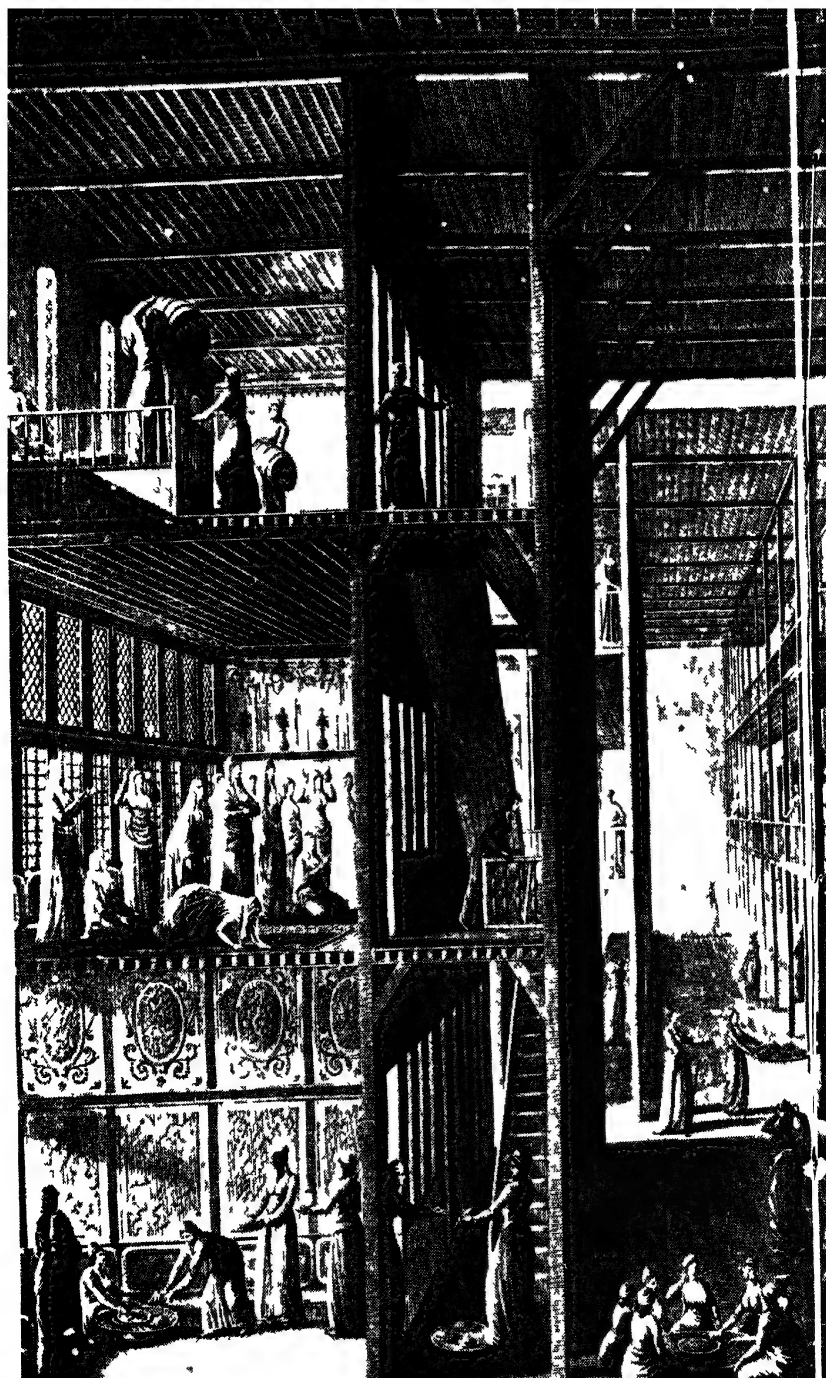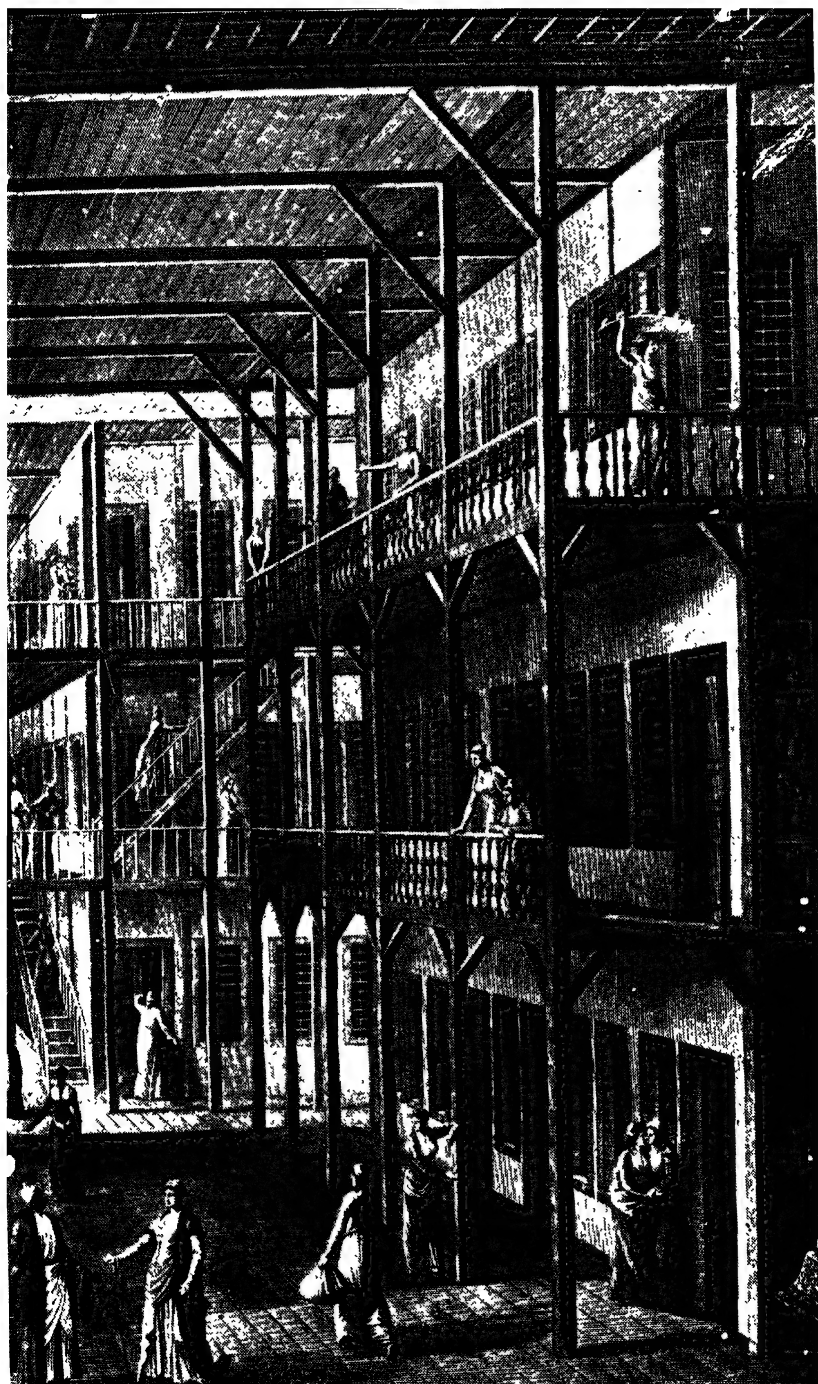
রমণীরা খাবার নিয়ে আনাগোনা করছে ; আলাপ-আলোচনা চলছে, মেয়েরা নতুন বান্ধবী খুঁজে নিচ্ছে, পুরনোদের হালচাল খবর করছে। —সব মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অভিনব, আকর্ষণীয়। তুর্কী হামামের তুলনা নেই।

তুলনা নেই অন্য আয়োজনেও। তুর্কী হামাম কয়েকটি বস্তুর ব্যাপক ব্যবহারের জন্য খ্যাত। একটি তাদের উঁচু গোড়ালিওয়ালা কাষ্ঠপাদুকা। স্নানঘরের গরম, ঠাণ্ডা বা নোংরা জল এড়াবার জন্য মেয়েরা তা ব্যবহার করত।

অনেকে বলেন, তুর্কীরা এই পাদুকা পেয়েছে ভেনিস থেকে। যেখান থেকেই আদিতে আমদানি করা হোক না কেন, সপ্তদশ শতকে তুর্কী হামামে এই পাদুকা অবশ্যব্যবহার্য। ভারতীয় সনাতন পাদুকার সঙ্গে এর পার্থক্য এই, কাঠের টুকরোটির ওপর কাঠ ব্যবহারের বদলে একটা চামড়ার টুকরো জুড়ে দেওয়া হত পাদুকার দুই প্রান্তে। আজ এই পাদুকা সর্বজন-পরিচিত। পুব, পশ্চিম সর্বত্রই কম-বেশি এর চল। কিন্তু তুর্কী হামামে সেদিন যা ব্যবহার করত রূপসীর দল, সে পাদুকা সত্যই বুঝি দর্শনীয়। ওঁরা একে বলতেন—'নালিন'। আবলুস, চন্দন, রোজ উড—ইত্যাদি মূল্যবান কাঠের ওপর জরির নক্সাকাটা চামড়া। কারও কারও পাদুকা আবার হীরকখচিত। এই ভারী পাদুকা নিয়েই লঘু পায়ে ঘুরে বেড়াত, স্নান করত বসনমুক্ত সুন্দরীর দল। দাসী অথবা সখীরা সাবান মাখাত তাদের গায়ে। এবং তৈলাদি।

তুর্কী হামামে এ ব্যাপারেও কিঞ্চিৎ নিজস্বতা আছে। স্নানের আগে মালিশ সেখানে চাই-ই চাই। পুরুষদের ক্ষেত্রে অবশ্যই। কখনও কখনও মেয়েরাও অঙ্গ এলিয়ে দিত সংবাহনের জন্য। এ কাজটুকু সাধারণতঃ খোজা দাসরাই করত। কখনও কখনও সখীরাও। ফল—দুই ক্ষেত্রেই অনেক সময় অস্বাভাবিকতার দিকে মোড় নিত। বেগমের স্নানসহচর খোজার কাহিনী আগেই বলা

হয়েছে। হারেমের হামামে এজাতীয় উপাখ্যান আরও অনেক। অগুণতি নারী এবং তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক সম্পর্কের কাহিনীও।

তুর্কী হামামে আর একটি নিত্য ব্যবহার্য বস্তু—'রুসমা' বা এক ধরনের লোমনাশক। সিরিয়ায় এই মলমটিকে বলা হত 'দোয়া', মিশরে—'নুরা'। প্রত্যেকটি স্নানঘরে ক্ষৌরকর্মের ব্যবস্থা ছিল। বিশেষতঃ মেয়েদের স্নানঘরে। কারণ—দেহকে নির্লোম রাখা তুর্কী রমণীর জীবনের অন্যতম সাধনা। দেহের কোন অংশকেই সে অপবিত্র রাখতে চায় না। এই জন্যই 'রুসমা'। কেউ একপাশে বসে আপন মনে নিজেই তা যত্ন সহকারে ব্যবহার করছে, কারও অঙ্গে 'রুসমা' প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছে কোন খোজা কিংবা কোন বান্ধবী।

হারেমে সদ্যাগত কুমারী মেয়ের স্নানের বিবরণটিও প্রসঙ্গতঃ শোনার মত। লেডি মন্টেগু লিখছেন—যারা সুলতানের সঙ্গে সহবাস করেছেন, অর্থাৎ যাঁরা অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ বেগম, তাঁদের চালচলন স্বভাবতই খুব সহজ। তাঁরা হামামে ঢুকেই মারবেল পাথরের সোফাগুলোতে বসে গেলেন। অন্যদেরও কোন জড়তা নেই। কুমারী মেয়েরা চটপট খুলে ফেলল নিজেদের পোশাক। মাথায় ফিতে বাঁধা কালো কেশরাশি ছাড়া তাদের অঙ্গে আর কোন আভরণ নেই। কিন্তু যে কুমারী আজ রাত্রে সুলতানের শয়নকক্ষে প্রেরিত হবে, তার হাবভাব স্পষ্টতঃই একটু অন্যরকম। দু'জন বর্ষিয়সী রমণী তাকে হাত ধরে নিয়ে এল হামামে। সে সুসজ্জিতা, সালঙ্কৃতা। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ নগ্ন। দু'জন বাঁদী রৌপ্যপাত্রে সুগন্ধি তৈলাদি নিয়ে সঙ্গে এল। কুমারীর পিছনে দীর্ঘ শোভাযাত্রা। কমপক্ষে ত্রিশ জন বাঁদী মিলে স্নান করাচ্ছে তাকে। মেয়েটি মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

জনৈক জন রিচার্ড এই অনুষ্ঠানের আর একটি বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি বলেন—স্নানঘরে সেদিন উৎসব। কারণ সে রাত্রিটিই এই স্নানার্থিনীর জীবনে প্রথম মিলন-রাত্রি। সেজন্য বান্ধবীরাও

সব মিলিত হয়েছে স্নানঘরে। সযত্নে তার দেহকে নির্লোম করা হল এই প্রথম। এবার থেকে নিয়মিতভাবে ওকে তা করতে হবে। তুরস্কে বিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে তা-ই নিয়ম। স্নান শেষে হামামের বিশ্রামশালায় খাওয়া-দাওয়া। তারপর নিঃশব্দে রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা।

মাঝে মাঝে বেগমদের স্নানঘরে সকৌতুকে উঁকি দিতেন সুলতানও। তুরস্কে সেটা খুব চলতি সখ ছিল না। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সৌখিন ছিলেন নাকি প্রথম মুরাদ (১৭৩০-৫৪)। বেগমরা সব সেমিজ পরে আসতেন হামামে। অলক্ষ্যে থেকে মুরাদ আড়ি পেতে থাকতেন তাঁদের আসার পথে।

সেদিনও খল খল খিল খিল হাসতে হাসতে একঝাঁক রাজহংসীর মত স্নানের ঘরে ঢুকেছেন একদল রূপসী। অঙ্গে তাঁদের স্নানের পোশাক, হালকা সেমিজ। কিছুক্ষণ গল্পগুজব, কানাকানি, ফিসফিস,—হঠাৎ অঘটন। বিস্মিত বিমূঢ় রূপসীর দল নিজেদের দেহের দিকে তাকালেন,—কোন্ যাদুবলে যেন টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ছে তাদের অঙ্গাবরণ। দেখতে দেখতে সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

নেপথ্যে রুমালে হাসি চাপলেন মুরাদ। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী তিনিই। সেলাইয়ের বদলে সেমিজগুলোতে তাঁরই নির্দেশে এক ধরনের বিশেষ আঠা ব্যবহার করা হয়েছিল। তাপ এবং বাতাসের জলবিন্দুর সংস্পর্শে এসে সে আঠা গলে গেছে, অঙ্গ থেকে খসে পড়ছে বস্ত্র। অঙ্গে বস্ত্র নেই কারও, কিন্তু মুখে প্রত্যেকের বিভিন্ন ভঙ্গী। কেউ বিস্মিত, কেউ বিমূঢ়, কেউ কৌতুকে সহাস্য, কেউ বা ক্রুদ্ধ। দৃশ্যটা সৌখিন সুলতানের পক্ষে উপভোগ্য নয় কি?

হারেমে অতএব আসল দুঃখী বোধ হয় এই নকল-স্বর্গের অধিপতি নিজেই। অনেক ক্ষমতা তাঁদের, অফুরন্ত ধন-দৌলত। বিশ্ব তোলপাড় করে সংগ্রহ করে এনেছিলেন অমূল্য রত্নরাজি। হারেমে কোন অলঙ্কারই বাদ ছিল না, আয়োজনে কোন বাসনার কথাই ভোলেননি ওঁরা। কিন্তু, আশ্চর্য নিয়তি! রিক্ততায় হারেম যেন তবু এক ধূ-ধূ মরুভূমি।

সবই ছিল। ভোগের জন্য 'কুবে-ই-খুফি', সেবার জন্য 'উসিকে-ই-খুদমৎই', সন্তানের জন্য 'কুবিলে-ই তারাবিয়ুৎ'। অর্থাৎ এক এক কাজের জন্য এক এক দেশের কন্যা। উনিশ শতকের শেষ দিকে সুদানে ঝড়ের মত আবির্ভূত হয়েছিলেন এক নকল-প্রবক্তা—এল-মাহ্‌দি। সুদানের প্রতিটি উপজাতির কাছ থেকে মুঠো মুঠো নারী নজরানা হিসাবে আদায় করেছিলেন তিনি। প্রতিদিন ক'ঘণ্টা তাদের সঙ্গে রকমারি অস্বাভাবিক আনন্দ-ক্রীড়ায় কাটত তাঁর। নারী সম্পর্কে অদ্ভুত সব ধারণা ছিল নাকি মাহ্‌দির। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তুর্কী মেয়েরা উষ্ণ। একমাত্র শীতকালেই তাদের ডাক পড়ত 'প্রবক্তা'র শয়নকক্ষে। গ্রীষ্মে তিনি সঙ্গ চাইতেন কৃষ্ণাঙ্গ আরব আর নিগ্রো মেয়েদের। অনেক হারেম-প্রভুর মনেই এজাতীয় নানা

কু-সংস্কার। কারও বা মনে অভিনবত্বের জন্য ব্যাকুলতা। কিন্তু হায়, তার পরেও বোধহয় গলা ছেড়ে বলা যাবে না, সুখী জীবন যাপন করে গেছেন এই পৃথিবীর সুলতান বাদশাহ, রাজা এবং রাজচক্রবর্তীরা। আপন হাতে রচিত হারেমের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে সুখের পথটি ভুলে গিয়েছিলেন অনেকেই।

অনেক নারী হাতে পেয়েছিলেন নাদির শাহ। অসংখ্য নারী। কিন্তু নাদির কাউকে হৃদয় সমর্পণের কথা ভেবেছিলেন বলে শোনা যায়নি। শেষকালে নিজের হারেম ভুলে এই নিষ্ঠুর পুরুষ নাকি তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন দিল্লীর এক সাধারণ গণিকার ঘরে। মেয়েটির নাম ছিল নূর বাঈ। ইচ্ছে করলে অনায়াসে তাকে লুণ্ঠিত সম্পত্তির ফর্দে জুড়ে দিতে পারতেন নাদির। কিন্তু শোনা যায়, নূর বাঈকে তিনি নগদ সাড়ে চার হাজার টাকায় কিনতে পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন। কেননা, এমন রমণী পারস্যরাজ নাকি জীবনে আর কখনও দেখেননি।

নিজের উচ্ছ্বসিত হারেম থাকতেও চতুর্দশ শতকের দিল্লীর এক সুলতান কুতুবুদ্দীন মুবারক নাকি পড়ে থাকতেন শহরের নিন্দিত এলাকায়। তাঁর চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড় চড় করে বেড়ে উঠেছিল গণিকাদের বাজার-দর। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছেন—আগে যে সুন্দরীর দাম ছিল তুই পাউণ্ড, তখন তাকে তু'শ পাউণ্ডেও পাওয়া তুষ্কর।

মোবারক এ ব্যাপারে একাকী নন। এত পেয়েও সম্রাট শাজাহানের নাকি একমাত্র তৃপ্তি ছিল পরকীয়া প্রেম। অন্ততঃ তু'জন নায়িকা ছিল তাঁর, হারেমে যাদের স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। একজন তাদের জাফর খাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার নাম ছিল—ফরজান বেগম, ওরফে বিবিজী। সম্পর্কে সে নাকি শাজাহানের শ্যালিকা। শালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ যখন উঠল জমে, শাজাহান তখন চাইলেন তু'জনের মধ্যের ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলতে। তিনি

স্থির করলেন—জাফর খাঁকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। মতলব শুনে ফরজান সম্রাটের হাত চেপে ধরল,—তার কি সত্যই কোন প্রয়োজন আছে? খাঁ সাহেবকে বরং পাঠিয়ে দাও দূরে কোথাও। জাফর খাঁ বদলী হয়ে গেলেন পাটনায়। তখন শুধু বিবিজী আর শাজাহান, শাজাহান আর বিবিজী। পরবর্তীকালে উজীরের পদ পেয়েছিলেন জাফর খাঁ। হয়ত-বা এবারও স্ত্রীর স্থপারিশের ফলেই!

দ্বিতীয় জন ছিল খলিলুল্লা খাঁর স্ত্রী। দিল্লীর পথের মানুষও এই অভিসারিকার পালকিটি চিনত। ম্যানুসি লিখেছেন—জাফর খাঁর স্ত্রীর পালকি দেখলেই ভিখারীরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়াত, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত—ওগো বেগমসাহেবা, ওগো বাদশাহের প্রাতরাশ, বান্দাদের দোয়া কর, আমাদের কিছু দিয়ে যাও। খলিলুল্লা খাঁর স্ত্রীর নাম দিয়েছিল ওরা বাদশাহের মধ্যাহ্নভোজ।

পরকীয়া প্রেমের উমেদার ছিলেন শেষ মুঘলসম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র আবুবকরও। নেহাতই বালক সে। তবু বাদশাজাদা রোজ সন্ধ্যায় হারেমের মায়া কাটিয়ে যাত্রা করত ফৈজবাজারের একটি বাড়ির দিকে। সেখানে কোন এক গলির কোন এক সাধারণ বাড়িতে থাকেন এক অসাধারণ রমণী—ফারখান্দা জামানি বেগম। তিনি নাকি উচ্চবংশের মেয়ে, নসিব খারাপ, তাই বিয়ে হয়েছে একজন সাধারণ পুরুষের সঙ্গে। সে বেচারার না আছে অর্থ বিত্ত, না আছে কোন সামাজিক সম্মান। স্থতরাং, জামানি বেগম নিজেই বেছে নিয়েছেন নিজের পথ।

জামানির ঘরে নগরের সম্ভ্রান্তদের আনাগোনা। অন্যতম তাদের বাদশাহ-তনয় আবুবকর। জামানির স্বামী দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়, আবুবকর শেষরাত্রি অবধি তার স্ত্রীকে নিয়ে নানা রঙ্গ করে। সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যেও বিরাম নেই তার অভিসারে।

ক'দিনের জন্য লড়াই করতে পাঠানো হয়েছিল শাহজাদাকে।

হিন্দোনে ফিরিঙ্গীদের দেখে পালিয়ে আবার সে ফিরে এসেছে জামানির ঘরে। সে রাত্তিরে আনন্দ-সভা চলল অনেকক্ষণ ধরে। অবশেষে কম্পিত চরণে মত্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন আবুবকর যখন বেরিয়ে এল পথে তখন দেখা গেল গলির দুয়ার বন্ধ। শহরের এক অখ্যাত পল্লীতে বন্দী হয়ে আছে সে। শাহজাদা রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল :—নিশ্চয় চালাকি করেছে কেউ। নিশ্চয় এটা কোন শত্রুর কাজ, দুষমন তাকে বেইজ্জতি করতে চায়। সে কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটি হাতে তুলে নিল। ঘুমন্ত দিল্লীকে কাঁপিয়ে শোনা গেল বাদশাহ-তনয়ের গর্জন—আমি জানতে চাই এসব কার কাজ! কোথায় গেল পাহারাওয়ালা?

সে দৃশ্য দেখে জামানি হেসেই খুন। বিস্তর রাগারাগি, হাঁকাহাঁকি এবং মারামারির পর অবশেষে ছাড়া পেল সম্রাট-তনয়।

পরদিন তার নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগ গেল বাদশাহের কাছে। অভিযোগ করেছেন মুফাত ইকরামউদ্দীনের পুত্র আসান-উল-হক।—মীর্জা আবুবকর অহেতুক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছেন, তাঁর রক্ষীদের আক্রমণে কয়েকজন পথচারী এবং চৌকিদার অহেত হয়েছে। ওরা আসান-উল-হকের বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্তরও কেড়ে নিয়ে এসেছে। অভিযোগ পত্র পড়ে বৃদ্ধ সুলতান কম্পিত হাতে এক কোণে লিখলেন তাঁর নির্দেশ—এই অনাচারের প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। বাদশাহের আদেশ প্রতিপালিত হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু এবিষয়ে কারও সন্দেহ নেই, আর যে ক'টি দিন বেঁচে ছিল তরুণ বাদশাজাদা, ফৈজবাজার এড়াতে পারেনি সে।

প্রাসাদে নৈশভোজের আয়োজনে ঘাটতি ছিল না। তারপরেও নাকি অধিকাংশ নবাব বাদশাহ অতৃপ্ত পুরুষ। উচ্ছিষ্টের লোভে তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন হারেমেরই আনাচে-কানাচে, কিংবা দেওয়ালের বাইরে—অন্যত্র। নানা বিকৃতি তাঁদের আচারে আচরণে, যৌন জীবনে।

শিশমহলে উলঙ্গ এক সুলতানের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে সূচনায়। তিনি তুরস্কের ওই কুখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম। প্রতি শুক্রবার একজন করে কুমারী মেয়ে সরবরাহ করতে হত তাঁকে। যখন যা খেয়াল হত তাই করতেন তিনি। তার নেশা ছিল উগ্রগন্ধের আতর। দাড়িতে, পোশাকে তা মেখে ঢুকতেন এসে তিনি হারেমে। আর এক নেশা ছিল তার লোমশ পশুর চামড়া সংগ্রহ। গোটা ঘর তাতে মুড়ে, নিজেও লোমওয়ালা পোশাক পরে বন্য পশুর মত আচরণ করতে চাইতেন তিনি। মেয়েরাও প্রাণ ভরে হাসি ঠাট্টা করত এই পাগলা-সুলতানকে নিয়ে। ইব্রাহিম ওদের যে কোন আবদার রক্ষা করতে পারলে খুশি। ওরা বায়না ধরল—আমরা একদিন বাজারে যাব।—বেশ, তা-ই হবে, রাজী হয়ে গেলেন ইব্রাহিম। ওরা বলল—আমরা বিনা পয়সায় সওদা করব।—বেশ, তা-ই হবে, ইব্রাহিম এবারও রাজী। ওরা বলল—আমরা বাজার করতে যাব মাঝ রাত্তিরে, গোটা রাজধানী যখন ঘুমোবে তখন। আদেশ দিলেন সুলতান—দোকানীদের আজ সারারাত দোকান খুলে বসে থাকা চাই! হারেমের মেয়েরা যা-ই বলে, তাতেই সায় মেলে সুলতানের। একবার একটি মেয়ে বলল—জাহাঁপনা, কি সুন্দর ঘন কালো দাড়ি আপনার। এতে জড়োয়া গয়না ঝুলিয়ে দিলে ভারি চমৎকার দেখাত। ইব্রাহিম সত্যি সত্যিই দাড়িতে হীরে-মুক্তোখচিত জাল লাগিয়ে হাজির হলেন একদিন—অন্তঃপুরে নয়, খাস দরবারে।

এহেন বিকারগ্রস্ত পুরুষ যে কখনও কখনও নির্মম ঘাতকের রূপ ধরবেন তাতে আর সন্দেহ কি! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যদিও তাঁর একটি পুত্রসন্তান ছিল, তবু সমসাময়িকেরা লিখে রেখে গেছেন—ইব্রাহিম ক্লীব ছিলেন।

তুরস্কের সুলতান ইব্রাহিমের তুলনায় ভারতের বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে বলা চলে রীতিমত সংযত এবং সুসংস্কৃত। পরবর্তী

জীবনে সুরা ছাড়া অন্য কিছুতে আকর্ষণ ছিল না তাঁর। নূরজাহান কড়াকড়ি নিয়ম করে দিয়েছিলেন, সম্রাট দিনে নয় পেয়ালার বেশি সুরা পাবেন না। একদিন রাত্তিরে দশম পেয়ালার জন্য বায়না ধরে বসলেন বাদশাহ। নূরজাহান কিছুতেই তা দবেন না। ক্ষিপ্ত জাহাঙ্গীর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর উপর। তারপর তিনি নাকি এক বন্য জন্তুর মত। সে জাহাঙ্গীরকে চেনা যায় না সহসা। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলেন নূরজাহান। পাশের ঘরে জনা কয় বাঈজী গানের আসরের আয়োজন করছিল। তারা ছুটে এল। ওদের দেখে সম্রাটের কিঞ্চিৎ সংবিৎ ফিরল। লজ্জায় হাত শিথিল হয়ে এল তাঁর। নূরজাহান মুক্তি পেলেন। কিন্তু তিনি আহত, ক্ষতবিক্ষত তঁার দেহ। এরপর অনেক দিন নাকি সম্রাটেব কাছাকাছি আসতে রাজী হননি তিনি। আজকের মনস্তত্ত্ববিদ এ জাতীয় ঘটনার অন্য রকম ব্যাখ্যাই করবেন হয়ত।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবও নাকি বিকৃত মনের পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে নারী সেজে পবীদের নিয়ে খেলা করতেন। সুবেশা নর্তকীদের পিঠে নকল পাখা বেঁধে দিয়ে পরী বানানো হত। স্লীম্যান লিখেছেন—তাঁর বাসনার অন্ত ছিল না। এবং নবাবের সব কামনা স্বাভাবিক পুরুষের কামনা নয়।

সিরাজউদ্দৌলার নেশা ছিল নাকি 'পাগলী' নাচ। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন—তিনি একমাত্র বীভৎস রসের রসিক ছিলেন। পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের নামেও নানা কথা শোনা যায়। একজন লিখেছেন—ইংরাজ রাজপুরুষ এবং বিদেশী ভ্রমণকারীরা রণজিৎ সিংহকে যে মোহিনী নর্তকীদের দিয়ে পরিবেষ্টিত দেখতেন তারা আসলে নারী নয়, রমণীর বেশে কম-বয়সী ছেলের দল। পুরুষসিংহ রণজিৎ সিংহ শয়নকক্ষে ছিলেন ভিন্ন রুচির পুরুষ। টিপু সুলতান সম্পর্কে লেখা হয়েছে—"উইমেন হ্যাড লং এগো স্যালেড দি টাইগার; অ্যানড হি ট্রায়েড বয়েজ অ্যাজওয়েল।" তরুণী

অথবা তরুণ—কিছুতেই আপত্তি নেই মহীশূর-ব্যাঘ্রের। মানুষ ছাড়া বনের প্রাণীকে নিয়েও নানা রকমের ক্রীড়া করতেন নাকি তিনি।

হতে পারে, বিশিষ্ট ক'জন ভারতীয় সম্পর্কে এসব ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ইচ্ছা-প্রণোদিত কুৎসা মাত্র। কিন্তু আজকের অনুসন্ধানকারীর মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, হারেম অস্বাভাবিকতার নরক। নানা ধরনের বিকার বিকৃতি সেখানে। বালকের প্রতি অনুরাগ সে-তুলনায় যেন কিছুই নয়। অনেক হারেম-প্রভুর কাছেই এদের আকর্ষণ দুর্নিবার। এমন কি স্বয়ং খলিফারাও যেন তার ব্যতিক্রম নন। একবার নাকি এক খলিফা আর তাঁর ভাইয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ বাধে। বিরোধের উপলক্ষ্য একটি রূপবান বালক। খলিফা ভাইয়ের ভয়ে তাকে আটকে রেখেছেন নিজের শয়নকক্ষে, তাঁর আশঙ্কা একে অপহরণের চেষ্টা চলছে। সেদিনকার হারেমে কত সুন্দরী মেয়ে আছে তা যেমন গর্বের বিষয়, পুরুষের আড্ডায় তার চেয়েও বেশি গৌরবের নাকি কার হাতে কী পরিমাণ বালক আছে তা-ই। কবিদের সুললিত পদ্যের উপলক্ষ্য তখন রূপসী তরুণী নয়, প্রিয় বালক!

বিকৃতির এটা একদিক মাত্র। হেকিম ছিল, ওঝা ছিল, উত্তেজক সুরা আরক, গন্ধদ্রব্য, তাবিজ, মাদুলি—কোন চেষ্টারই অন্ত ছিল না। তবু অনিবার্যকে ঠেকাতে পারেননি ওঁরা। বিচিত্র পথে উন্মাদের মত চরিতার্থতা খুঁজেছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ আরও অক্ষম, আরও রিক্ত। নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা ছাড়া তাঁদের জীবনে আর কোন আনন্দ নেই। তাই লোকে বলে, হারেমে সবচেয়ে দীন মানুষ তার অধীশ্বর স্বয়ং। তিনি সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে বঞ্চিত।

খোজারা কেউ কেউ প্রতিশোধ নিয়েছিল। বাদশাহের পৌরুষকে আড়ালে ব্যঙ্গ করত ওরা। উপহাসের পাত্র তিনি এদের কাছে। প্রতিশোধ নিয়েছিল বেগম, বাঁদী, বিবিরাও। সবাই নিঃশব্দে আপন ভাগ্যকে মেনে নেয়নি। অজস্র, সহস্রবিধ পথে চরিতার্থতা খুঁজেছে তারাও। মোহিনী কখনও নাগিনী, সম্রাটের হৃদয়মণি কখনও হৃদয়-হীনা ছলনাময়ী। তার জরিমানা হিসাবে যেমন জীবন ধরে দিতে হয়েছে অনেককে, ঠিক তেমনই নিশ্চয় শাস্তিও এড়িয়ে গেছে অসংখ্য। জাহানারার প্রণয়ী যুগলের কথা আগে বলা হয়েছে। দু'জনকেই হত্যা করেছিলেন শাজাহান। কিন্তু তৃতীয় ?

জাহানারা বলতেন ওকে—দুলেরা। বাদশাজাদীর নর্তকীদের কারও একজনের পুত্র সে। দুলেরা বয়সে তরুণ, দেখতে সুপুরুষ। সম্রাট-নন্দিনী বাস করতেন আপন প্রাসাদে, বাদশাহী অন্তঃপুরের বাইরে। সেখানেই নাকি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঐ বালক। জাহানারার চোখের সামনেই বড় হয়েছে সে। জনশ্রুতি, সম্রাট-দুহিতা তার কাছেই পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে। দুলেরাকে নানা সম্মানেও ভূষিত করেছিলেন তিনি, তার নিজস্ব তাঞ্জাম ছিল, নিশান ছিল।

পতাকা উড়িয়ে জাহানারার প্রিয় ভৃত্যেরা একদিন চলেছে প্রাসাদের দিকে। পথে মহব্বত খাঁর সঙ্গে দেখা। মহব্বত এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারলেন না। তিনি নিজের পতাকা নামিয়ে নিলেন। তারপর বিরস বদনে হাজির হলেন শাজাহানের কাছে। শাজাহান জানতে চাইলেন—নিশানই বা কোথায় গেল? মহব্বত উত্তর দিলেন—আজকাল নর্তকীর সন্তানরাও দরবারী নিশান উড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছে যখন, তখন মুঘল বাদশার নিশানের আর মান কোথায় জাহাঁপনা? ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটাই সম্রাটের কাছে নিবেদন করলেন মহব্বত খাঁ। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন সম্রাট আকবরের নিষেধাজ্ঞার কথা,—তিনি না বলে গিয়েছেন—শাহজাদীদের বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়! অহেতুক সিংহাসনের দাবিদার বাড়ানো হবে তাতে, সাম্রাজ্য খান খান হয়ে যাবে।

শাজাহান যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারলেন না। জাহানারাকে তিনি জানিয়ে দিলেন—তার বাসনা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অক্ষম।

জাহানারার জানতে বাকি ছিল না এসব কা'দের পরামর্শের ফল। শুধু মহব্বত নয়, আরও শত্রু আছে তাঁর। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। মুঘল-সংসারে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, উদারতায়, বিচক্ষণতায় তিনি অতুলনীয়া। এই জাহানারাই অতঃপর চক্রান্তেও নিপুণা। শত্রুদের একজন শায়েস্তা খাঁ। তিনি শাজাহানের নিকট-আত্মীয়। বাদশাহ খাঁ সাহেবের ভগ্নীপতি। তা হোক, তাঁর সুখকে কেড়ে নিচ্ছে যারা, জাহানারা তাদেরও সুখে থাকতে দেবেন না। প্রাসাদ থেকে শায়েস্তা খাঁর স্ত্রীর নামে নিমন্ত্রণ এল একদিন,—বেগম-সাহেবার আমন্ত্রণ। তিনি বলে পাঠিয়েছেন—খাঁ সাহেবের স্ত্রী এলে তিনি খুব আনন্দিত হবেন। শায়েস্তা খাঁর পত্নী গ্রহণ করলেন সে আমন্ত্রণ। আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি ঘটল না। ভোজের পর নৃত্যগীত। সকলে যখন সে আসরে মগ্ন, জাহানারা তখন অতিথিকে

একান্তে ডাকলেন। তারপর হাত ধরে তাকে নিয়ে হাজির হলেন একটি কক্ষে। শায়েস্তা খাঁর পত্নী সভয়ে দেখলেন, অস্পষ্ট আলোয় সেখানে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ওত পেতে বসে আছেন শাজাহান। ঘরে সুরার উগ্র গন্ধ। পালাবার আর কোন পথ নেই। নিঃশব্দে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন জাহানারা। দুয়ার বাইরে থেকে বন্ধ।

ম্যানুসি লিখেছেন—এর পর অনেকদিন শান্তি ছিল না খাঁ সাহেবের ঘরে।

ইউরোপীয় পর্যটকরা দিল্লী আর আগ্রার হাট-বাজার থেকে যেসব কাহিনী কুড়িয়েছেন সেগুলো সত্য হলে, মেনে নিতে হয়, রোশনারাও হয়ত সেই অর্থে পুরোপুরি নিষ্কলুষ ছিলেন না। দুই দুইবার খোজা প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছিল তাঁর প্রেমিকেরা। আউরঙ্গজেব মুক্তি দিয়েছিলেন তাদের, বলেছিলেন—যে পথে এসেছিলে সে পথেই ফিরে যাও। শাস্তি পেয়েছিল দ্বাররক্ষক এবং প্রাসাদের অন্য প্রহরীরা। রোশনারা ঘটনাগুলোকে কীভাবে নিয়েছিলেন তা জানার উপায় নেই। তিনি মন পালটেছিলেন কিংবা ওরা পালটে ছিল প্রাসাদে আনাগোনার পথ—সে কাহিনী জানে একমাত্র হারেমের রহস্যময় রাত্রি। ম্যানুসি শুধু জানিয়ে গেছেন—বাদশাহী হুকুম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতেও মোটেই আটকাত না হারেমের মেয়েদের। এমন যে গোঁড়া বাদশাহ আউরঙ্গজেব, তিনিও ক্ষণে ক্ষণে জব্দ তাদের কাছে।

হারেম সহ বাদশাহ তখন কাশ্মীরে। সঙ্গিনীদের মধ্যে অন্যতম জর্জিয়ার মেয়ে উদিপুরী। দারার পত্নী ছিলেন তিনি। তাঁকে হত্যা করার পর বিজয়ী আউরঙ্গজেব হাত বাড়িয়েছিলেন তাঁর হারেমে। একজন বেগম জবাব দিয়েছিলেন—নিজের হাতে নিজের রূপকে বিনাশ করে, তীক্ষ্ণ ছুরিতে ছবির মত মুখটিকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত-মাখা রুমাল উপহার পাঠিয়েছিলেন তিনি বাদশাহকে। উদিপুরী তা

পারেননি। হারেম ভোগবাদীদের আস্তানা। সেখানে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছুই নেই। কিছু আহাম্মক, বেকুব স্বেচ্ছায় মরত বটে, কিন্তু অধিকাংশই বেঁচে থাকত নতুন পরিবেশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে। উদিপুরীও তা-ই করেছিলেন। আউরঙ্গজেবের প্রিয় বেগমের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনি। সম্রাট আলমগীর তাঁর দাসানুদাস। অন্য বেগমেরা স্বভাবতই ঈর্ষাকাতর। একদিন সন্ধ্যায় দল বেঁধে তাঁরা হাজির হলেন বাদশাহের সামনে।—এমন মনোরম সন্ধ্যায় বাদশাহ কেন একাকী? তার চেয়ে সকলে মিলে অবসর-বিনোদন—সে-ই ভাল নয় কি? আউরঙ্গজেব রূপবতীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি বললেন—বেশ, তাই হোক। একটি তরুণী বলে উঠল—কিন্তু তার আগে উদিপুরী বেগমকে চাই। সে না হলে কোন আনন্দ-সভাই জমে না। অন্যরাও সায় দিল তার কথায়,—সত্যিই উদিপুরী যেন মূর্তিমান খুশি! বাদশাহ ইঙ্গিতে একটি বাঁদীকে কাছে ডাকলেন। মহলে গিয়ে বেগমকে বল—আমি তাকে স্মরণ করেছি। উপস্থিত বেগমরা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তাদের সুর্মা-টানা চোখের কোণে দুষ্ট হাসি।

বাঁদী ফিরে এল।—বেগমের শরীর ভাল নেই! তাঁর মাথা ধরেছে। উদ্বিগ্ন আউরঙ্গজেব আর একজনকে পাঠালেন। সেও একই উত্তর নিয়ে ফিরে এল। এদিকে অন্য বেগমদের চোখে মুখে হাসি যেন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আউরঙ্গজেব বুঝে উঠতে পারছেন না ব্যাপার কী। বাদশাহ নিজেই এবার পা বাড়ালেন অসুস্থ বেগমের মহলের দিকে।

ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলেন সম্রাট। এমন দৃশ্য দেখতে হবে তিনি আশা করেননি। ঘরে সুরার গন্ধ। নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছে উদিপুরী। তার আসন বসন কিছুই যথাস্থানে নেই। সম্রাটকে দেখে সংবিৎ ফেরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না বেগমের কথা-

বার্তায়। যেন কোন খোজা এসেছে ঘরে, আরও এক পাত্র সুরার জন্য বেগম কাকুতিমিনতি করতে লাগল তার কাছে।

আউরঙ্গজেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দৃশ্য দেখে অন্য বেগমরা হেসে খুন—জাহাঁপনা, তবে না আপনি ঘোষণা করেছিলেন হারেমে সুরা নিষিদ্ধ!

হারেমে সুরা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সব হারেমেই তবুও স্রোত বইত নাকি সুরার। যেখানে কড়াকড়ি খুব বেশি, সেখানে বেগমেরা অসুস্থতার ভান করে চলে যেত নাকি হাসপাতালে। তুর্কী হারেমের হাসপাতালে সুরা পাওয়া যায়, সুরা সেখানে দাওয়াই। মুঘল হারেমে চোরাই পথে সুরা আসত প্রায় সব ঘরেই। বাদশাহরা যদি বিলাসী, তবে সমান বিলাসিনী বেগমরাও।

একবার রাজধানীর মোল্লারা এসে দাঁড়ালেন আউরঙ্গজেবের কাছে,—পীর-ই-দস্তগীর, সালাম। আমাদের একটি নিবেদন আছে হজরত। আপনি রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছেন বটে, কিন্তু হাটে হাটে সর্বত্র গুজব, হারেমে মদ্য চলে। জেনানাদের ওপরও হুকুম জারি করা প্রয়োজন বোধ হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য, হারেমের মেয়েদের মধ্যে আটো-সাঁটো পোশাকের প্রচলন বন্ধ করা হোক। ওঁরা যদিও বাইরে বের হন না, তবু অন্যত্র ব্যাধি সংক্রমিত হতে কতক্ষণ? আউরঙ্গজেব বললেন—তাই হবে।

যথাসময়ে সম্রাটের নির্দেশ পৌঁছল হারেমে। বেগমরা মুচকি হাসলেন। প্রধানা বেগম চিবুকে অঙ্গুলি ঠেকিয়ে চোখ বুজলেন, নিশ্চয়ই এটা বুড়ো মোল্লাদের কাণ্ড। শেষে কিনা পোশাকের ওপরও খবরদারি করার বাসনা!

মুঘল হারেমে শুধু রূপ নয়, আর একটি চর্চার বিষয় ছিল পোশাক—পোশাকের আধারেই না পরিবেশন করতে হয় রূপকে! নূরজাহান কাপড় আর কাঁচি নিয়ে খেলতে খেলতে নাকি আবিষ্কার করেছিলেন একালের কাঁচুলি। অন্যদের টুকিটাকি অবদানও অনেক।

এবার সব বাতিল করে বোরখাকে সর্বস্ব বলে মেনে নিতে হবে? কক্ষনো তা হয় না।

অনেক ভেবেচিন্তে শহরের বিশিষ্ট মোল্লাদের পত্নীদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন বেগম আপন মহলে। বাদশাহের হারেমে ডাক পড়েছে, অতএব ওঁরা এলেন সবাই সেরা পোশাকে। আর সেরা পোশাক মানেই তো সেই পোশাক, যা অঙ্গে তুলে নেওয়ার পর নারীর রূপ চাপা পড়ে না, তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আভা ফুটে বের হতে চায়। বেগম তাঁদের সাজের বহর দেখে অতিশয় প্রীত।

ভোজের পর সুরার ফোয়ারা ছুটল মহলে। তৃষ্ণার্ত মোল্লা-পত্নীরা আকণ্ঠ পান করলেন মদিরা। দেখতে দেখতে তাঁরা অপ্রকৃতিস্থ। ঠিক এই দৃশ্যটিই মনে মনে কল্পনা করেছিলেন বেগম। এজন্যই তাঁর এই ভোজসভার আয়োজন।

মহলে ডাক পড়ল সম্রাটের। বেগমসাহেবা নিজেই এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন তাঁকে। নিয়ে এলেন সেই কক্ষটিতে যেখানে নেশাগ্রস্ত মোল্লাপত্নীরা হুল্লোড়ে মত্ত।

দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন আউরঙ্গজেব। হেসে বেগম বললেন —এই তো দুনিয়া জাহাঁপনা, নিজের ঘরকে সামলাবার ক্ষমতা নেই যাঁদের, তাঁরাই শুধবে বেড়াচ্ছেন অন্যের ঘর।—কিব্‌লা-ই-দীন দুনিয়া, এঁরা আপনার প্রিয় মোল্লাদের ঘরের জেনানা!

—তোবা! তোবা!—মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আউরঙ্গজেব।

বলা চলে, এসব নির্দোষ আমোদ। বাদশাহকে জব্দ করার ছলে রঙ্গিনীদের ক্রীড়া মাত্র। শুধু কি তাই? এসব কাহিনী থেকে বোধ হয় বড় মহলের চলার ভঙ্গিটিও আচ করা যায়।

এখানে এক ছাদের তলায় হাজার রূপসীর মেলা। বাইরের পৃথিবীতে জীবনের রঙীন শোভাযাত্রা, ভেতরে রাজ্যভারে ক্লিষ্ট, বহু আমোদে ক্লান্ত একটি পুরুষের এলোমেলো অস্থির পদধ্বনি। তদুপরি সামনে লোভের হাতছানি—সিংহাসন। হারেম কি তারপরও স্বর্গ? একদিকে তুলনাহীন রিক্ততা আর অতৃপ্তি, অন্যদিকে রকমারি প্রলোভনের হাতছানি—স্বর্গ রচনা কি সত্যিই সম্ভব ছিল এখানে? মুসা-হাইদর যা-ই বলে থাকুন, ইতিহাস বলবে—না। হারেম স্বর্গ নয়। ষড়যন্ত্র যদি এখানে নিত্যকার ঘটনা, তবে বিকৃতিও এখানে জীবনের অঙ্গ। তার হাত থেকে শুধু সুলতান নয়, রেহাই নেই বেগম-বাঁদীদেরও। "দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার সল্পভূমি মধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না"—এই উক্তি মোটেই মিথ্যা নয়। যেখানে হারেম, সেখানেই অনাচার, অত্যাচার।

হয়ত দু'হাজার বেগম, কিন্তু সন্তান চাওয়ার অধিকার মাত্র চার জনের। তাও চাওয়ার অধিকার মাত্র। পেলেও সাধারণতঃ ওঁরা

কোলে রাখতে পারতেন মাত্র একজনকে। অপ্রয়োজনীয় সন্তান খোজার কোলে রাতের অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করত। সৌভাগ্য-বশতঃ বেঁচে থাকলে পরিচয়হীন মানবসন্তান হয়ে রাজধানীতে নগণ্যের ভিড় বাড়াত। উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা সিংহাসন এবং কারাগার, জীবন এবং মৃত্যু—দুটোর একটা বেছে নিত। কিন্তু সে-সব অপেক্ষাকৃত উদার হাওয়াতেই সম্ভব। অতি সতর্ক সুলতান দু'একজনের বেশি উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকতে দিতেন না। ফলে অধিকাংশ জননী সারা জীবন নীরবে কাঁদতেন।

হারেমে অনেক নারী সে কান্নার স্বাদটুকুও জানতে পারেনি। অনেক ঐশ্বর্য দেখেছে তারা, অনেক মসলিন কিংখাবে অঙ্গ মুড়েছে, জড়োয়ার ভার বইতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করেছে, কিন্তু কোনদিন সন্তান ভারে নয়। হাতে গোলাপ, বসনে আতর, চোখে কাজল—সবই ছিল, কিন্তু জননী হওয়ার সামর্থ্য ছিল না তাদের। ওরা নাকি এক ধরনের চিরযৌবনা। কোন দেবতার বরে নয়, এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যৌবনও একই লালসার কারিগরী। সুলতান বাদশাহরা আপন কামনাকে তৃপ্ত করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, সহস্র খোজার বেষ্টনীতেও তাঁদের উদ্বেগ দূর হত না, অতএব মেয়েদেরও কখনও এক ধরনের খোজায় পরিণত করতেন নাকি ওঁরা। সে-সব পুতুল শুধু গর্ভধারণে অক্ষম নয়, সর্ব কামনা-বাসনামুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের হারেমে হারেমে এখনও নাকি আছে এই রূপসী নারীর দল। তারা প্রভুকে কেবলই দেয়, নিজেরা পায় না কিছুই। ওরা 'চর্মপাত্র' মাত্র।

আরও একদল ছিল। সে সব নারী সম্পূর্ণত নয়, অংশত খোজা। অস্ত্রোপচারের পিছনে মতলব ছিল নাকি নারী আর নারীর মধ্যে অন্যতর সম্পর্কের সম্ভাবনা মুছে দেওয়া। প্রথম দলের বিকৃতির হেতু সহজেই বোঝা যায়। ওরা পায় না কিছুই, কিন্তু পেতে ইচ্ছে করে সব। দ্বিতীয় দলের তৃপ্তিবিধান কোন স্বাভাবিক সুলতানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের আনন্দ দান করতে পারে একমাত্র কোন

কোন খোজা, অথবা আর কেউ; সৌখিন সুলতানের সে সাধ্য নেই। বিকৃতি অতএব দু'শ্রেণীর নারীর আচরণেই।

নানাভাবে অন্ধকারে সাধনা চালাত ওরা। অবিশ্বাস্য পথে তৃপ্তি খুঁজত। কেননা, খোজার স্পর্শটুকুও সবসময় সহজলভ্য নয়। একজন সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন—ফরাসী এবং ইংরেজ সৈন্যরা চীনা সম্রাটের হারেমে এমন সব সরঞ্জাম খুঁজে পেয়েছিল যা স্বাভাবিক মানুষের চিন্তার বাইরে। মধ্যপ্রাচ্যের হারেমগুলোতেও পাওয়া যেত ক্ষুধার্ত মেয়েদের মনের হাহাকারের রকমারি প্রমাণ। হয়ত হিন্দুস্থানের হারেমগুলোতে কৃত্রিম-করণ কৌশলাদি অজ্ঞাত ছিল না। একজন পশ্চিমী পর্যটক লিখেছেন—হারেমে শুধু বাইরের পুরুষ আর সুরা নয়, নিষিদ্ধ ছিল আরও কিছু কিছু বস্তু,—"nor do they permit of radishes, cucumber or similar vegetables that I cannot name."

বিকৃতির ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ নয়। বাসনা তৃপ্তির একটি উপায় ছিল স্বপ্নকে আশ্রয়। স্বপ্নে 'জিন্' এসে নাকি আনন্দ দিয়ে যেত ওদের। কখনও কখনও 'জিন্'-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত হারেমের কোন গলির বাঁকে, অথবা উদ্যানের ছায়ায়। তুর্কী হারেমের একটি গলি-পথের নাম ছিল—"জিন্-এর আনাগোনার পথ"।

সুলতানের পক্ষে অবিশ্বাস করার উপায় নেই।—হ্যাঁ, স্বপ্নে পুরুষের সঙ্গ সম্ভব বই কি। তিনিও তো ঘুমন্ত অবস্থায় কতবার কাছে পেয়েছেন হুরীদের। 'জিন্'কে কাজে লাগাতে পারত একমাত্র বুদ্ধিমতীরাই। কখনও কখনও ওই দেওয়াল পেরিয়ে তারা বাইরেও চলে যেত। প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ হত ফেরিওয়ালীর মাধ্যমে। কিংবা কোন খোজার সাহায্যে। পলায়ন কষ্টসাধ্য হলেও, চতুরিকার পক্ষে সবই সম্ভব। একটা সুযোগ করে রেখেছেন সতর্ক পুরুষকুল নিজেরাই। বোরখা পরিয়ে দিয়েছেন তারা ঘরের হুরীদের দেহে। একবার তোরণ পার হতে পারলে

বোরখার আড়ালে কে চলেছে অভিসারে তা জানার উপায় নেই। আব্দুল ওয়াহেব নামে দিল্লীতে এক কাজী ছিলেন। তাঁর কাহিনী শুনিয়েছেন ম্যানুসি। দেওয়ালে সুড়ঙ্গ কেটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তাঁর মেয়েটি। তারপর প্রেমিকের সঙ্গে গিয়ে হাজির হল বাবার দফতরে। ওরা কল্‌মা পড়ে বিয়ে করতে চায়। পর্দানসীন কনে, কাজী জানতেই পারলেন না কার বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি!

এ সুযোগ সকলে পেত না। সুতরাং, হারেমেই 'জিন্' খুঁজে নিত তারা। কোন হিংসাকাতর খোজা হয়ত ব্যভিচারের প্রমাণ হিসাবে শয্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবে, বুদ্ধিমতী হেসে উত্তর দেবে—নিশ্চয় বাদুড়ের কাণ্ড! নয়ত কৈফিয়ত দেবে—'জিন্'। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—হারেমের সব কাহিনী জানতে পারলে নিশ্চয় মস্ত মস্ত রাজবংশগুলোর পরিচয় নতুন করে লিখতে হত। তৈমুরের জন্মও নাকি কুমারী মেয়ের গর্ভে। সন্দেহাতুর পিতাকে জানিয়েছিল কন্যা—আমার সন্তানের জনক সূর্য। তবু খটকা রয়ে গেল পিতার মনে, অবশেষে সন্দেহভঞ্জন হল সেদিন, যেদিন নিজের চোখে দেখলেন, গবাক্ষ দিয়ে সত্যিই সূর্যালোক এসে পড়েছে কন্যার শয্যায়!

হারেম মিথ্যাচারে ভরা। কোন কোন নির্লজ্জ রমণী অবশ্য সত্যকে গোপন রাখা প্রয়োজন মনে করত না। -শাজাহান-বান্ধবীদের কথা আগেই বলা হয়েছে। লক্ষ্মৌর ওয়াজিদ আলি সাহেবের খাস মহলের নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মন্ত্রী আলি নকি খানের সঙ্গে। শুনে নবাবমাতা চিন্তিত। তিনি পুত্রকে সাবধান করে দিলেন,—আর কিছু নয়, নষ্ট মেয়ের পক্ষে বিষ প্রয়োগ করতে কতক্ষণ! নবাব বললেন—দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি। তিনি মন্ত্রীর এক বোনকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলেন। তাঁর যুক্তি—এবার নিজের স্বার্থেই মন্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই নবাবকে!—তাই নয় কি?

ওয়াজিদ আলি খেয়ালি মানুষ। তাঁর চলনভঙ্গী সবসময়ই একটু অন্য রকম। আর একবার রেসিডেন্টের তরফ থেকে সাবধান করে দেওয়া হল,—নবাব কি জানেন তাঁর একজন বেগম নষ্ট চরিত্রের? তিনি নবাবের প্রিয় গায়ক আগা মীরের সঙ্গে রাত কাটান? নবাব বললেন—জানি বই কি! নিশ্চিন্ত থাকতে পার সাহেব, আমি ওকে প্রাসাদছাড়া করছি।

মেয়েটির নাম ছিল সরফরাজ মহল। নবাব বললেন—তোমাকে এই প্রাসাদ ছাড়তে হবে।—সানন্দে! জবাব দিয়েছিল মেয়েটি।—চিরকাল আমি অসতী। নবাব নিশ্চয়ই তা জানতেন। এবার জেনে যান, এখনও তা-ই আছি, ভবিষ্যতেও তা-ই থাকব!

মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের বিখ্যাত বেগম ঘসিটি এবং তাঁর বোন সিরাজ-জননী আমিনা সম্পর্কেও নানা রটনা। আমিনার প্রেমিক ছিলেন নাকি হুসেন কুলি। ঘসিটি সিরাজের কাছে মতিঝিলের প্রাসাদ সমর্পণ করার আগে শর্ত করে নিয়েছিলেন,—সব ছাড়তে পারি, তবে তার আগে কথা দিতে হবে, নাজির আলি'কে নির্বিঘ্নে বাংলাদেশ ত্যাগের সুযোগ দেওয়া হবে! নাজির আলিই ছিল বেগম ঘসিটির প্রেমিক। উল্লেখ্য, এই দুই বোনই বিবাহিত ছিলেন এক সময়। এবং দু'জনেই সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা।

যারা এমন সম্ভ্রান্ত নয় এবং সুযোগও যাদের কম, তারা স্বভাবতই অন্য ভাবে প্রতারণার চেষ্টা করত' ম্যানুসি একজন তরুণী ক্রীতদাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। হঠাৎ খবর এল—শাহ আলমের এক বাঁদী পাগল হয়ে গেছে। সে খেতে চায় না, ঘুমোতে চায় না। মাঝে মাঝে একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়, চুল ছেঁড়ে, নিজের হাত পা নিজে কামড়ায়। ম্যানুসি রোগিণীকে ভাল করে দেখলেন। পরিপূর্ণ যৌবন মেয়েটির দেহে। তিনি বিধান দিলেন—এর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হোক। শাহ আলমের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বিদেশী হেকিমের। তিনি রাজী হলেন। তাজ্জব কাণ্ড,

সত্যি সত্যিই বিলকুল সেরে গেল মেয়েটি। চিকিৎসক সকৌতুকে শুনলেন—সে মা হতে চলেছে।

হারেমে এবার পাগল হওয়ার ধুম পড়ে গেল। দুদিন পরে পরেই নতুন নতুন রোগিণীর সংবাদ। ম্যানুসি মনে মনে হাসলেন, কিন্তু শাহ আলমকে কিছু বললেন না। তাঁর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আরও কয়েকটি বাঁদী মুক্তি পেল।

কেউ কেউ সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যেত। অন্য ধরনের পাগল। হারেম থেকে ছাড়া পেলেও কোন দিনই স্বাভাবিক মানবীর জীবন এবং হৃদয় ফিরে পেত না তারা। তুরস্কের অনেক সুলতান পূর্ববর্তী সুলতানের হারেমকে ছুটি দিয়ে দিতেন, তারপর নিজের মনের মত করে নতুন হারেম সাজাতেন। কুখ্যাত ইব্রাহিমের হারেম থেকে সে ভাবেই ছুটি পেয়েছিল সুলতানা স্পরকা। ইব্রাহিমের অন্যতম 'খাদিন' ছিল সে। ছাড়া পাওয়ার পর একজন পাশা রূপসীকে তুলে নিলেন নিজের ঘরে। কিন্তু ভূত-পূর্ব 'খাদিনে'র যেন সংসারে মন নেই। অসুখী পাশা কিছুদিনের মধ্যেই চিরতরে বিদায় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য চেহারা এই হারেম-কন্যার। সে স্বামীর হারেম ভরে তুলেছে সুন্দরী মেয়ে সংগ্রহ করে। ওই তার নেশা। একদল সংগ্রহ করে, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে হারেমেব যোগ্য করে বেচে দেয় হাটে। আবার সংগৃহীত হয় নতুন দল। হারেমের জীবন তার কাছে অজ্ঞাত নয়, তবুও মেয়ে হয়ে কচি-কাঁচা মেয়েদের সে তুলে দিচ্ছে হাতে হাতে! হারেমের প্রভুরাও বিস্মিত তার হৃদয়হীনতা দেখে।

আরও নানা রকমের বিকার। হারেম হাহাকারে বোঝাই। কামনা-বাসনা এখানে সতত সাপের মত কিলবিল করে। ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত তাদের কামনার তীব্রতা দেখে স্তম্ভিত।

পারস্য যুদ্ধের সময়কার বিজয়ী বাহিনী যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই দরজা ভেঙ্গে তাদের কাছে ছুটে আসছে হারেম-কন্যার দল। ক্ষুধার্ত

জন্তুর মত ফিরছে ওরা। তারা অর্থ চায় না, খাদ্য চায় না, উপহার চায় না, আনন্দ চায়। দৈহিক আনন্দ। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন—"general orders and righteous padres directed the soldiery to respect the zenana ; but the moslem of the most delicate breeding cast off their veils and gave themselves to victors."

যে হারেম অতি-বনেদি, যুগ-যুগের সঞ্চিত বিকৃতির ফলে যেখানে স্থায়ী অন্ধকার, সেখানে হারেম-কন্যাদের আচরণ নাকি আবার সম্পূর্ণ অন্য রকম। জীবনে পুরুষকে প্রত্যাশা করতেও নাকি ভুলে যায় ওরা, নানা ধরনের বিকৃতির কাছে আত্মসমর্পণকেই মেনে নেয় স্বাভাবিক জীবন বলে। সুতরাং, বছরের পর বছর অন্ধকারে থাকা বন্দীর চোখে হঠাৎ আলো পড়লে যেমন অন্ধ হয়ে যায় সে, তেমনই নাকি অন্ধ হয়ে উঠেছিল সেইসব হারেম-নিবাসী রূপসীর দল।

১৮৪১ সনের কথা। কাবুলে মোতায়েন ব্রিটিশ বাহিনীর তরুণ সৈনিকেরা জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত। বহুকাল নারীর মুখ দেখেনি তারা। একদল সৈন্য খোজা প্রহরীদের হাতে কিছু ঘুষ গুঁজে দিয়ে এক রাত্রে দেওয়াল পেরিয়ে ঢুকে পড়ল আমীরের জেনানা মহলে। পরীরা হঠাৎ তাদের দেখে চমকিত। ভাবল, বুঝি 'জিন্' এল ঘরে! কিন্তু একি, 'জিন্'দের মুখে পরদেশী বুলি কেন? নিশ্চয় এরা এই দুনিয়ারই মানুষ—পুরুষ। আমীরের হারেমবাসিনী নারীর দল পুরুষের অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছে ততদিনে। পরিতৃপ্তির অন্য পথ খুঁজে নিয়েছে তারা, পুরুষ তাদের কাছে অবান্তর। সুতরাং, প্রথম চমক কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা আগন্তুক দলের ওপর। খোজা প্রহরীদের সাহায্যের দরকার হল না। নিজেরাই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল প্রতিটি ইংরাজ তরুণকে।

পরদিন দেশে বিদ্রোহ। নারীর ইজ্জতের নামে দিকে দিকে আগুন। সে আগুনে প্রাণ দিলেন স্যর আলেকজাণ্ডার বার্ণেস, আফগানিস্থানে নিযুক্ত রেসিডেন্ট কমিশনার। প্রাণ গেল কোম্পানির হাতে গড়া আফগান-রাজা শাহ্ সুজারও। প্রজারা ক্ষমা করল না তাঁকেও। জেনানার ইজ্জত বাঁচাবার ক্ষমতা যাঁর নেই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না। তাঁর চেয়ে ওই সিংহীর মত নারীর দলই শ্রেয়, কাম্য, শ্রদ্ধেয়।

কিন্তু সত্যিই কি ওরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষার জন্য হত্যা করেছিল বিদেশী তরুণদের? আজকের গবেষক মাথা নাড়েন। তাঁরা বলেন—এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যৌন-বিকৃতিরই ফল। হিংসাকাতর রমণীদল নিজেদের হাতে খোজা বানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের হারেমের ইতিহাসে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী যেমন আছে, তেমনই আছে আরবী সাহিত্য এবং উপকথার অজস্র উপাখ্যান—নারী যেখানে পুরুষকে চায় না, বেবুন কিংবা অন্য কোন ইতর প্রাণীর আলিঙ্গনের জন্য ব্যাকুল।

আরবের এক নায়িকার কাহিনী।

রমণী জেগে দেখল, তার প্রিয় বেবুনটির মৃতদেহ পড়ে আছে তার পাশে। কাছেই দাঁড়িয়ে হত্যাকারী তরুণ। সে বলল—পুরুষও আছে বইকি এই পৃথিবীতে! নারীর উক্তি—সে তুমি জানবে না, বুঝবে না, এই জন্তু আমার কাছে কী ছিল—এরপর আর আমার বেঁচে থাকার কোন বাসনা নেই। কাঁদতে কাঁদতে সত্যিই প্রাণ বিসর্জন দিল সে।

হারেম শুধু মুসলমানী ব্যাপার নয়। যেখানেই অতুল ঐশ্বর্য আর অপ্রতিহত ক্ষমতা, সেখানেই পরিমাণহীন লালসা। মুসলমান বাদশাহের সঙ্গে হিন্দু রাজার গার্হস্থ্য জীবনে স্বভাবতই পার্থক্য সেদিন সামান্য।

রামায়ণ মহাভারতের রাজন্যবর্গের সংসার-সংবাদ বাদই দেওয়া গেল। কৌটিল্য বর্ণিত রাজ-অন্তঃপুরে উঁকি দেওয়া যাক একবার।

কৌটিল্য বলেন—অন্তঃপুরকে সম্পূর্ণভাবে বিপদ-মুক্ত করতে হলে তাকে বাইরের প্রভাব থেকে আড়াল করা চাই। দুয়ারে প্রহরী হিসাবে মোতায়েন করতে হবে নারী রক্ষী। প্রতিটি দায়িত্বশীল পদে বহাল হবে নারী কর্মচারী। তাদের ওপর চোখ রাখবে নারী গুপ্তচর। গুপ্তচরদের ওপর নজর রাখবে আর একদল গুপ্তচর। অর্থাৎ সমগ্র অন্তঃপুর পরিণত হবে এক গুপ্তচরশালায়! প্রত্যেকে সেখানে নজর রাখবে প্রত্যেকের উপর।

কড়া নির্দেশ দিয়েছেন চাণক্য—অন্তঃপুরবাসিনীদের কখনও দেওয়ালের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। বাইরের কাউকেও আসতে দেওয়া হবে না ভেতরে। আনাগোনার সব পথগুলো বন্ধ রাখা চাই। কেননা, তিনি বলেন—নয়ত যে কোনও সময়ে নরপতির

জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। তারও নমুনা দিয়েছেন তিনি।

> ঃ রাজা ভদ্রসেনকে হত্যা করেছিলেন তাঁর নিজের ভাই। রানীর শোয়ার ঘরে লুকিয়ে ছিলেন তিনি। রাজা কুরুশ নিহত হয়েছিলেন তাঁর পুত্রের হাতে। সেও পালিয়ে ছিল শয্যাগৃহে, মায়ের পালঙ্কের তলায়। খইয়ের সঙ্গে মধুর বদলে বিষ মাখিয়ে কাশীরাজকে হত্যা করেছিল তাঁর পুত্র। রাজা বৈরাণতেয় নিহত হয়েছিলেন তাঁর রানীর ষড়যন্ত্রে। পায়ের মলে বিষ মাখিয়ে রেখেছিলেন রানী। রাজা সৌবীরকে হত্যা করেছিলেন তাঁর রানী আরও নিপুণ কৌশলে—বিষপ্রয়োগেই। রাজা জালুথাকে হত্যা করেছিলেন তাঁর রানী হাতের আর্শির সাহায্যে। তাতে বিষ ছিল। রাজা বিতুরথকে হত্যা করেছিলেন তাঁর রানী ছুরিকাঘাতে। কেশবতী মাথার চুলে লুকিয়ে রেখেছিল অস্ত্র।

হিন্দুরাজার অন্তঃপুরেও ষড়যন্ত্র অতএব অজ্ঞাত ছিল না। মেগাস্থিনিসও সাক্ষ্য দিয়েছেন—এজন্যে চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে সতর্কতার অন্ত ছিল না। সশস্ত্র নারীবাহিনী প্রাসাদ রক্ষা করত। সম্রাটের দেহরক্ষীও ছিল তারাই। সম্রাটের খাদ্য, পানীয়, সম্রাটের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, কিংবা উপহার হিসাবে পাওয়া পুষ্পস্তবক, সবকিছু তারা আগে পরীক্ষা করত, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখত, তারপর তুলে দিত সম্রাটের হাতে।

বিলাসের এটা একদিক মাত্র। অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের ভেতরে কী হত তার খবর। রাজকীয় বিলাস, বলা নিষ্প্রয়োজন, দেওয়ালের বন্ধন স্বীকার করত না, তার বাইরেও মহামান্য সম্রাটের জন্য বিপুল আয়োজন। অর্থশাস্ত্রে এদের বলা হয়েছে—নগরের রূপোপজীবিনী। উৎসবে, আনন্দে প্রাসাদে ডাক পড়ত সেই সুন্দরী দলের। দরবারের তরফ থেকে একজনকে নিযুক্ত করা হত

প্রধানা, সে—'গণিকা'। সহস্র 'পান' তার মাসোহারা। সে রূপসী চৌষট্টি কলায় নিপুণা। তারপরও আছে আরও অসংখ্য। তারা রূপ ও গুণ অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন। সকলেরই মাইনে আসে রাজকোষ থেকে। প্রধান কাজ তাদের সম্রাটের মাথার ওপরে ছত্র ধরে থাকা, কিংবা চামর দোলান। সম্রাট যখন দোলায় বা রথে চড়ে কোথাও যাবেন তখনও সঙ্গে থাকবে ওরা। এরা সম্রাটের দাসী, সেবিকা, সহচরী, কখনও বা প্রমোদসঙ্গিনী। শুধু সম্রাট নয়, তাঁর নির্দেশে যে কোন অমাত্য কিংবা অতিথিকে প্রমোদ-দানে বাধ্য তারা। কেউ যদি অসম্মতি জানায় তবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। একমাত্র নিষ্কৃতি—প্রত্যাখ্যানের কারণ যদি হয় ব্যাধি।

গণিকার মর্যাদা ছিল প্রাচীন এবং মধ্যযুগের নগরে নগরে। বাৎসায়ণের বিবরণ অনুযায়ী নাগরিকের জীবনে অন্যতম আনন্দের উপাদান তারা। রাজপ্রাসাদেও বিলক্ষণ খাতির তাদের। তুঙ্গভদ্রাতীরে বিশাল রাজধানী শহর বিজয়নগরের দিকে তাকানো যাক।

বিজয়নগর রাজের হারেম বা অন্তঃপুর সুপ্রসিদ্ধ। ১৪২০ সনে পশ্চিমী পর্যটক নিকোলো কন্টি এসেছিলেন দক্ষিণের এই বিখ্যাত হিন্দুরাজের রাজধানীতে। তিনি লিখে গেছেন : এই রাজ্যের রাজা ভারতের আর সব রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্ত্রী-সংখ্যা সাকুল্যে ১২০০০। তার মধ্যে চার হাজার সব সময় রাজার পায়ে পায়ে ফেরে। তাদের ওপর রান্নাবান্নার ভার। চার হাজার চলাফেরা করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে। বাদ-বাকিরা দোলায়। এদের মধ্যে দুই থেকে তিন হাজার রাজার মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরবে বলে কথা দিয়েছে। এই শর্তেই তাদের বিয়ে করেছেন রাজা।

এর কিছুকাল পরে (১৫২৭) পাইস নামে আর এক পর্যটক এসেছিলেন বিজয়নগরে। তিনি কন্টির হিসাব তছনছ করে দিয়েছেন

বটে, কিন্তু বিজয়নগর রাজের বিলাস কাহিনী তাঁর বিবরণে আরও স্পষ্ট। পাইস বলেন—রাজার ধর্মপত্নী মাত্র বারো জন। এদের মধ্যে প্রধান তিন জন। একমাত্র এই তিন রানীর পুত্ররাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী গণ্য হওয়ার যোগ্য। অবশ্য এদের কারও পুত্রসন্তান না থাকলে অন্য কথা।

এই দ্বাদশ কন্যা কী করে ঘরে এসেছে সে তথ্যও জানিয়েছেন পাইস। তিনি বলেন—এদের মধ্যে এগা৲ জনই আশপাশের নানা রাজ্যের রাজকন্যা, কেউ কেউ তাঁর অধীন রাজাদের ঘরের মেয়ে। অবশিষ্ট মেয়েটি—নর্তকী। তরুণ রাজকুমাবের প্রিয় রক্ষিতা ছিল সে। তখনই সোহাগী যুবরাজের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—রাজা হলে আমাকে রানী করবে তো? রাজার ছেলে কথা দিয়েছিল—নিশ্চয়। কথা রেখেছিলেন যুবরাজ। ভূতপূর্ব নর্তকী আজ বিজয়-নগর রাজের অন্যতমা পত্নী।

রানীদের চাল-চলনের বিবরণও রেখে গেছেন পাইস।

> : প্রত্যেক রানীর জন্য স্বতন্ত্র কুঠি, স্বতন্ত্র দাসী, পরিচারিকা এবং রক্ষীর বন্দোবস্ত আছে। সব কাজেই একমাত্র মেয়েদেরই নিযুক্ত করা হয় সেখানে। খোজা প্রহরী ছাড়া কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। কোন পুরুষ কখনও অন্দরের মেয়েদের দেখতে পায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ত উচ্চপদস্থ বৃদ্ধ কোন রাজকর্মচারী। মেয়েরা যখন বাইরে যায় তখনও তাদের দিকে তাকাবার উপায় নেই। তারা দোলায় চড়ে চলাফেরা করে। সে-সব দোলার দুয়ার বন্ধ। সঙ্গে থাকে তিন-চারশ' খোজা প্রহরী। জনতা স্বভাবতই তাদের পথ থেকে দূরে থাকে। তাদের কাছ থেকেই শুনেছি, প্রত্যেক রানীর অতুল ঐশ্বর্য এবং প্রত্যেকের সহচরীর সংখ্যা ষাট জন। তারাও সালঙ্কৃত এবং সুসজ্জিত।

রানীর সংখ্যা বারো বটে, কিন্তু পাইসও মনে করেন, রাজার অন্তঃপুরে সাকুল্যে নারী আছে বারো হাজার।—"তাদের মধ্যে কারও কারও হাতে ঢাল-তলোয়ার, কেউ বা মল্লযুদ্ধ করে, কারও কারও কাজ গীতবাদ্য। এছাড়া কেউ পরিচারিকা, কেউ রাঁধুনী, কেউ বা ধোপানী।"

ঃ রাজা প্রাসাদের ভেতরেই নিজের মহলে থাকেন। তিনি যখন কোন রানীর সঙ্গ কামনা করেন তখন আপন মনোবাসনা জানিয়ে সেই রানীর কাছে দূত হিসাবে একজন খোজাকে প্রেরণ করেন। খোজা রানীর কক্ষে প্রবেশ করে না। সে রানীর দ্বাররক্ষী মেয়েদের কাছে বক্তব্য নিবেদন করে। তারা ব্যাপারটা রানীর গোচরে আনে। রানী তখন আপন সহচরীকে পাঠান রাজার কাছে, সত্যিই তিনি কী চান সবিস্তারে তা জেনে আসার জন্যে। তারপর রানী নিজে যাবেন রাজসন্দর্শনে, কিংবা দবকার হলে রাজা নিজেই আসবেন অতি সংগোপনে রানীর কক্ষে। কোথায় ওঁরা মিলিত হয়েছেন সেটা গোপন খবব। কারও তা জানবার অধিকার নেই। সেই কক্ষে প্রহরী রাজার বিশ্বস্ত খোজা।

এত আয়োজনের পরও ছিল সনাতন সেই নাগরিকার দল। মন্দিরে, প্রাসাদে সর্বত্র অবাধ গতায়াত তাদের। রাজানুকূল্যে তারা শুধু গরবিনী নয়, ধনশালিনীও বটে। পাইস লিখেছেন—কার সাধ্য আছে ওদের ঐশ্বর্যের যথাযথ বিবরণ দেয়? সর্বাঙ্গে তাদের মণিমুক্তা, হীরা-জহরত। অনেককেই ভূসম্পত্তি দেওয়া হয়েছে, দোলা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে অগণিত দাসদাসীও। পারশ্য রাজের দূত আবদুল রেজাক তাদের দেখে বিস্ময়বিমূঢ়। তিনি লিখেছেন: ওদের ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদের জাঁকজমক বর্ণনার অতীত।

বিজয়নগরের এইসব ইতিবৃত্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কথা। পড়তে পড়তে মনেই হয় না, ভারত মৌর্য আমলকে আঠারশ'

বছর পিছনে ফেলে এসেছে। সেই বিপুলায়তন অন্তঃপুর, সেই নারী-বাহিনী, সেইসব সাবধানী নিয়ম-কানুন।

শুধু হিন্দুর রাজকাহিনীতে নয়, অন্তঃপুর তেমনই বহুবর্ণ জৈন সাহিত্য এবং রাজকীয় সমাচারেও। একটি জৈন শাস্ত্র (Vivagasuya) অনুযায়ী অন্যতম শ্রেষ্ঠ জৈন নরপতি মহাসেনের অন্তঃপুরে স্ত্রী ছিল এক হাজার। রাজকুমার শিহসেনের ছিল পাঁচশ! স্বভাবতই অন্তঃপুরে নাকি অশান্তি লেগেই থাকত, বিশেষতঃ শিহসেনের অন্তঃপুরে।

পাঁচশ' রানীর মধ্যে রাজা সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন শ্যামা নামে একটি মেয়েকে। তার সাহচর্য আর সান্নিধ্যেই রাত্রি দিন অতিবাহিত হত নরপতির। বাকি চারশ' নিরানব্বুই জন রানী অতএব ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা নিজ নিজ বেদনার কাহিনী আপন আপন মায়ের গোচরে আনলেন। চারশ' নিরানব্বুই শাশুড়ী ষড়যন্ত্রে বসলেন। স্থির হল—শ্যামাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। শিহসেন যথাসময়ে সে সংবাদ শুনলেন। কিন্তু এমন ভান করলেন যেন কিছুই তিনি জানেন না। হঠাৎ একদিন রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ গেল শ্বশুরালয়ে শ্বশুরালয়ে। রাজা এক সন্ধ্যায় শাশুড়ীদের আপ্যায়ন করতে চান। এই ভোজসভার জন্য একটি মণ্ডপ তৈরী করা হল। যথাসময়ে এসে সমবেত হলেন চারশ' নিরানব্বুই শাশুড়ী। ওঁরা যখন ভোজনে মগ্ন, তখন অলক্ষ্যে মণ্ডপের সব ক'টি দুয়ার বন্ধ করে দিলেন শিহসেন, তারপর রাজার ইঙ্গিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল তাতে। চারশ' নিরানব্বুই শাশুড়ী পুড়ে মরলেন, সেই সঙ্গে ছাই হয়ে গেল চারশ' নিরানব্বুই রানীর সাধ আর স্বপ্ন। নিশ্চিন্ত, আনন্দিত রাজা শ্যামার কোলে নিজেকে সমর্পণ করলেন।

নিষ্ঠুরতায় শ্যামা একাকিনী নয়, রাজগৃহের রাজা মহাশয়ের প্রধানা রানী রেবাই-এর সতীন ছিলেন বারো জন। তাদের মধ্যে

ছয়জনকে হত্যা করেন রেবাই বিষপ্রয়োগে, বাকি ছয় জনকে অস্ত্রাঘাতে। তারপর থেকে মহাশয় তাঁর একান্ত আপন।

নিষ্ঠুরা আর কুটিলারাই নয়, শীর্ষে উঠত নিপুণারাও। রাজা জিয়াসত্তু নতুন এক কন্যাকে আনলেন অন্তঃপুরে। রূপবতীর নাম কন্যামঞ্জরী। চিত্রকরের ঘরের মেয়ে সে। দেখতেও ছবির মত মনোহর। পুরো ছয়মাস ধরে কন্যামঞ্জরীর ঘর থেকে আর বের হলেন না রাজা। চমকপ্রদ সব গল্প বলে রাজাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে চিত্রকরের মেয়ে। আহার-নিদ্রা ভুলে রাজা সব সময় তার কাছে কাছে। অন্য রানীরা বললেন—এ মেয়ে নিশ্চয় মায়াবিনী, কোন গোপন মন্ত্রবলে রাজাকে বশ করেছে। এর প্রতিকার না হলে রাজত্ব ছারখার হয়ে যাবে। সুযোগ পেয়ে একদিন রাজার কাছেই নালিশ পেশ করলেন তাঁরা। খটকা রাজার মনেও—তাই তো—!

তিনি হুকুম দিলেন—এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়া চাই।

তদন্ত হল। কন্যামঞ্জরী হেসেই খুন—দূর ছাই, মন্তর আবার কিসের? মায়ের কাছ থেকে নানা কাহিনী শিখেছিলাম, তাই শুনেই তো মহারাজ আমার বশ। রাজাও সায় দিলেন তার কথায়। চিত্রকরের কন্যা মুক্তি পেল। কুটিলা রানীদের শাস্তি দিলেন রাজা, তিনি ঘোষণা করলেন—আজ থেকে কন্যামঞ্জরীই আমার পাটরানী।

অর্থশাস্ত্রের মতই জৈনদের শাস্ত্রেও বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে অন্তঃপুর-শাসন সম্পর্কে। জৈন শাসকদের অন্তঃপুরে তিনটি মহল; প্রথমটিতে থাকে 'জিন্না'—অর্থাৎ বৃদ্ধারা, দ্বিতীয়টিতে 'নব'—অর্থাৎ অন্তঃপুরের আসল ধন যুবতী মেয়েরা, তৃতীয়টিতে—'কন্যা'—অর্থাৎ কম-বয়সী বালিকারা। অর্থশাস্ত্রে খোজাদের নিয়োগের পরামর্শ নেই, অন্তঃপুরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেয়েদের। কিন্তু জৈন শাসকদের অন্তঃপুরে মুঘল হারেমের মতই খোজাদের ছড়াছড়ি। কী করে খোজা গড়তে হয় এবং কী তাদের দৈহিক ও

মানসিক বৈশিষ্ট্য, সবিস্তারে তারও আলোচনা করেছেন জৈন শাস্ত্রকাররা। কাজ অনুযায়ী ওদের ভাগ করা হয়েছে পাঁচ ভাগে। (১) কানুচুকিন। হারেমের যে কোন কক্ষে যদৃচ্ছ আনাগোনা করার অধিকার আছে তার। রাজাকে অন্তঃপুর সম্পর্কিত যাবতীয় খবর সরবরাহের দায়িত্ব তারই উপর। (২) বরিসাধর। সে রক্ষীদলের নায়ক। সাধারণ অন্তঃপুরের দেওয়াল বন্ধনীতেই জন্ম তার। অন্তঃপুরের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বাল্যকালেই খোজা করা হত তাকে। (৩) মহাত্তারা। সে বার্তাবহ। রাজা এবং রানীদের মধ্যে সেতুবন্ধের মত। সে-ই মনোনীতা রানীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত রাজার কক্ষে। আবার ভোর রাত্রে ফিরিয়ে নিয়ে আসত তৃপ্ত রানীকে নিজের মহলে। এ ছাড়াও আরও কিছু কিছু কাজ ছিল তার। বানীদের অবসর বিনোদনে অন্যতম সঙ্গী সে,—নানা খোশ-গল্পে তাদের আনন্দদান তার কর্তব্য। কোন রানী গোসা করলে তার মানভঞ্জনের প্রাথমিক চেষ্টা তাকেই করতে হবে। সে ব্যর্থ হলে তবেই রাজার পালা। (৪) দণ্ডধর। তার কর্তব্য অন্তঃপুরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।...এছাড়া আরও নানা ধরনের পদ। তবে পদ-গৌরব যার যা-ই থাকুক না কেন,—সবাই তারা খোজা।

এত সতর্কতার পরেও, বলা চলে না, জৈন রাজন্যবর্গের অন্তঃপুর সম্পূর্ণ বিপদ-মুক্ত ছিল। কখনও কখনও চিরকালের সবচেয়ে চালু ছাড়পত্র অর্থের বলে অন্তঃপুরের লৌহ-কপাট খুলে ফেলে ভেতরে এসে হাজির হত অভিযাত্রী। ইঙ্গিতে দুয়ার খুলে যেত অতৃপ্ত রূপবতীর মহলের। কখনও বা খবরাখবর আদান-প্রদান হত ফেরিওয়ালীদের মাধ্যমে, নায়ক কখনও কখনও এসে হাজির হত মিস্ত্রিদের ভিড়ে মিশে গিয়ে, ওদেরই একজন হয়ে। জৈন অন্তঃপুরে, অতএব, কড়া হুকুম ছিল—মানুষ তো বটেই, বাঁদরও যেন ঢুকতে না পারে রানীদের মহলে।

তা হলেও সে অন্তঃপুরকে নিষ্কলুষ রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সে

কথা জানিয়ে গেছেন বাৎস্যায়ন। তিনি খোজাদের বর্ণনা দিয়ে তাদের নানা যৌন-বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। বাৎস্যায়ন বলেছেন—এসব নিন্দনীয়। কিন্তু তাঁর স্বীকৃতি থেকেই বোঝা যায়, নিন্দনীয় হলেও অন্তঃপুর সব সময় এসব কদাচার-মুক্ত ছিল না। বাঁদর সম্পর্কে উদ্বেগ, কে জানে, তার পিছনেও কোন বিকারের ঘটনা ছিল কিনা!

উপসংহারে, অথ পুষ্প-চয়ন কাহিনী। তুর্কী হারেমে নারী সংগ্রহ করা হত কী উপায়ে, মুঘল হারেমেই বা আসত ওরা কোন্ পথে, সে সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ আগে বলা হয়েছে। হিন্দু এবং জৈন-হারেমেও নারী সংগ্রহের পন্থা বহুবিধ ; বিবাহ, অপহরণ, কেড়ে আনা, কড়ির মূল্যে কিনে নেওয়া—কোন পথই এ ব্যাপারে দোষণীয় নয়। বৃহৎ-কল্প ভাষ্যে এক তরুণ রাজকুমারের কথা বলা হয়েছে। একদিনে পাঁচশ রূপবতী কন্যা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি—যেন এক অভিযানে পাঁচশ’ হরিণ শিকার! সবাই ভদ্রঘরের মেয়ে। ওঁরা এক জায়গায় সমবেত হয়েছিলেন ইন্দ্র উৎসব উপলক্ষে। সেখান থেকেই অতর্কিতে সৌখিন রাজকুমারের উদ্যোগী অনুচরেরা জাল ফেলে ধরে এনেছিল সেই অসহায় মেয়েদের। নগরময় চাঞ্চল্য। প্রজারা, বিশেষতঃ হতভাগ্য মেয়েদের অভিভাবকেরা ক্ষুব্ধ। তারা সমবেত ভাবে অভিযোগ পেশ করলেন রাজার কাছে।—মহারাজ, সুবিচার চাই। মহারাজ অনেক ভেবেচিন্তে বললেন—আপনাদের কন্যারা যদি আমার পুত্রবধূ হন, সেটা কি আপনাদের পক্ষে খুবই অসম্মানের ব্যাপার হবে? প্রজারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল,—না, সে কথা বলি কি করে? মহারাজ বললেন—তবে আপনারা সানন্দে ঘরে ফিরে যান। আমি ঘোষণা করছি—এই পাঁচশ’ কন্যাই আমার পুত্রবধূ।

‘কল্প সূত্রে’ কোশাম্বীর রাজা সুমুখের উপাখ্যান আছে। অন্তঃপুর বোঝাই রূপবতী নারী থাকা সত্ত্বেও তিনি পরকীয়া প্রেমে আনন্দ

পেতেন বেশি। একবার একজন সাধারণ নাগরিকের পত্নীর প্রতি আসক্ত হলেন সুমুখ। তাঁর লালসা কুলবধূকে টেনে আনল রাজকীয় অন্তঃপুরে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে 'রাজতরঙ্গিনী'র এক রাজার কথা। তিনি আপন মন্ত্রীর স্ত্রীকে দেখে উন্মাদপ্রায়। শেষ পর্যন্ত আর মনোবাসনা গোপন রাখা সম্ভব হল না। রাজা বললেন—মন্ত্রী, তোমার ঘরে যে গোলাপ সেটি আমি চাই। মন্ত্রী বুঝলেন, প্রতিবাদ অর্থহীন। তিনি বললেন—মহারাজ, অতি উত্তম কথা। আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যদি আমার স্ত্রীকে আপনার হাতে তুলে দিই তাহলে রাজ্যের জনসাধারণ বলবে—রাজা পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত, মন্ত্রীকে অক্ষম পেয়ে তাঁর ঘরের ধন নিয়ে এসেছেন নিজের ঘরে। সেটা আপনার এবং আমার দু'জনের পক্ষেই খুব অপমানকর ব্যাপার হবে। তার চেয়ে এক কাজ করি। আমি আমার স্ত্রীকে মন্দিরে উৎসর্গ করে দিচ্ছি। সে শুধু রূপবতী নয়, নৃত্যগীতপটিয়সীও। সুতরাং, সব দিক থেকেই দেবদাসী হওয়ার যোগ্যা। তারপর, দেবভোগ্যাকে রাজভোগ্যায় পরিণত করতে আর কতক্ষণ!

সবাই এমন উদারপ্রাণ স্বামী ছিলেন না। কাঞ্চনপুরের রাজা এক বণিকের সুন্দরী স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পত্নীকে হারিয়ে বণিক উন্মাদ, শোকে দুঃখে কয়দিনের মধ্যেই প্রাণ হারালেন বেচারা। আর একবার উজ্জয়িনীরাজ গন্দাবিল্ব কলক নামে একজন সাধারণ নাগরিকের বোনকে অপহরণ করেছিলেন। মেয়েটি ছিলেন জৈন সন্ন্যাসিনী। রাজা জোর করে তাকে নিয়ে এলেন নিজের অন্তঃপুরে। কলক বোনের অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যাত্রা করলেন পারস্য। সেখান থেকে নাকি ছিয়ানব্বই জন রাজা এসেছিলেন সন্ন্যাসিনীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে!

উল্লেখ্য, এমন মেয়েও ছিল, রাজকীয় হাতছানির উত্তরে যে

সবিনয়ে জানিয়েছিল—না। বিজয়নগরের ইতিহাসে তেমন এক তরুণীর কাহিনীও আছে। রাজার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। বলেছিল—আমি রাজ-অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য চাই না—আমার কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান—স্বাধীনতা।

এখানে সব কিছুই ছিল। আবার অনেক কিছুই ছিল না। সুখ ছিল। দুঃখও ছিল। আনন্দ ছিল। ছিল বেদনাও। কিন্তু ছিল না স্বাধীনতা। নিঃশর্ত স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও নেই। কিন্তু হারেমে কেবলই শর্ত, স্বাধীনতা এখানে স্বপ্ন হিসাবেও নিষিদ্ধ যেন। যাঁরা নানা আঁকাবাঁকা পথে বেপরোয়া সংগ্রামের মাধ্যমে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা হাতে পেতেন, তাঁরাও সদাশঙ্কিত। তহবিলে রেশমী রুমাল যত বাড়ে, ততই বাড়ে উদ্বেগ। অতএব মুক্তির দিন সত্যি সত্যিই যেদিন এল, হারেমের নারীর দল সেদিন আনন্দিত। কেননা, এ মুক্তি একজন ভাইয়ের উদ্যোগে একজন বোনের মুক্তি নয়, সকলের মুক্তি,—শত শত বছরের প্রাচীন ব্যথার অবসান। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯০৯ সনের কথা। তুরস্কে ঝড়ের মত আবির্ভূত হয়েছে নবীন বিদ্রোহী, মুস্তাফা কামাল। গদীচ্যুত সুলতান জনাকয় বেগম সমেত নির্বাসিত হলেন সালানিকায়। কামাল পাশা ঘোষণা করলেন—অতঃপর হারেম নিষিদ্ধ হল তুরস্কে। বেগমরা মুক্ত। তাঁরা যেখানে খুশি যেতে পারেন। যাঁদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তাঁদের দায় নতুন সরকারের।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন—সে এক স্মরণীয় দৃশ্য। এমন

শোভাযাত্রা কেউ কখনও দেখেনি। একত্রিশটি গাড়ি বোঝাই হয়ে হারেমের মেয়েরা চলেছেন ইলভিজ থেকে টপ্-কাপু প্রাসাদের দিকে। পনের থেকে পঞ্চাশ,—নানা বয়সের তিনশ' সত্তর জন নারী। সবাই রূপবতী। অধিকাংশই জাতে সিরকাসিয়ান। ওরা রূপে অতুলনীয়। দামেও। আনাটোলিয়ার গাঁয়ে গাঁয়ে আগেই প্রচারিত হয়েছিল কামালের নির্দেশ,—মা বাবা কিংবা নিকট-আত্মীয়রা এসে নিজেদের মেয়েদের নিয়ে যেতে পারেন। যদি অভাবের তাড়নায় আপন হাতে বিক্রি করে দিয়ে থাকেন কেউ, তাহলেও ভাবনার কিছু নেই। কেড়ে আনা হয়েছিল যাদের, তাদের মতই বিক্রি-করা মেয়েরাও মুক্ত এখন।

খবর পেয়ে পাহাড় থেকে ঘোড়ায় চড়ে সমতলে নেমে এসেছিল আনাটোলিয়ার কৃষক আর শ্রমিক বাপ-মায়ের দল। সেও এক দৃশ্য। বহুকাল পরে মেয়ে বাবাকে সামনে পেয়ে উন্মাদের মত জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মায়ের কোলে মাথা রেখে মেয়ে কাঁদছে, বোনকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদছে বোন। আপন গাঁয়ের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে একটি মেয়ে,—বাবা কেন এল না? মা এখনও বেঁচে আছে তো? ফ্যাল ফ্যাল করে বোকার মত তাকিয়ে আছে এক বৃদ্ধ;—কই, আমার মেয়েকে তো দেখতে পাচ্ছি না! এগিয়ে এলেন এক বর্ষীয়সী মহিলা। সান্ত্বনা দিচ্ছেন তিনি বৃদ্ধকে—কী করবে ভাই, সবই নসিব। দু'হাতে চোখ ঢেকে হাউ হাউ করে উঠল বুড়ো চাষী।

কাঁদল আরও অনেকে। কেউ আপন জনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে, কেউ হারানোর দুঃখে। কিন্তু কেউ কাঁদল না সুলতান আবদুল হামিদের জন্য। একবার পিছনে তাকাল না কেউ। ত্রস্ত হাতে আপন আপন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সবাই চলল যে-যার ঘরে। কেউ বলবে না, প্রাসাদ থেকে কুটিরে যাচ্ছে ওরা,—'স্বর্গ' থেকে পৃথিবীতে ফিরছে।

———

পরিশিষ্ট

এই গ্রন্থে প্রধানত তুর্কী স্থলতানদের হারেমের কাহিনী বলা হয়েছে। মধ্য প্রাচ্যে অটোমান তুর্কীদের সগৌরব আবির্ভাবের স্থচনা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে। তার আগে তুর্কীরা একটি উদ্দাম উপজাতি মাত্র। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের প্রথম কাজে লাগান আনাটো-লিয়ার রুম সেলজুকরা (Rum Seljuks)। তাদের দুয়ারের অদূরেই তুর্কীদের শিবির। মুঘলদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে সেলজুক আমীর আলা আল-দীন তাদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তুর্কীদের নায়ক তখন এরতোগ্রুল (Ertoghrul)। তিনি সাড়া দিলেন। কিন্তু তার আগে একটি শর্ত মেনে নিতে হল আলা আল-দীনকে,—এই সাহায্যের বদলে তুর্কীদের বসবাস করার জন্য এক ফালি জমি দেওয়া হবে। মুঘলরা বিতাড়িত হল। ভূমি-ক্ষুধার্ত তুর্কীরা নেমে এল আনাটোলিয়ার সমতলে। সাকুল্যে চারশ' পরিবার ওরা। দিন শান্তিতেই কাটাতে থাকে। ১২৯৯ সনে এরতোগ্রুল মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন নতুন দলপতি—ওতমান (Othman)। স্থদর্শন এই নবীন নায়ক চালচলনে সম্রাটের মত। অচিরেই জানা গেল, তিনি হতেও চান সম্রাট। আনাটোলিয়ার মাঝখানে কয়েক একর জমিতে আর আটকে রাখা গেল না দুর্ধর্ষ তুর্কীদের। ওতমানের নেতৃত্বে তারা বিজয় নিশান হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল দিকে দিকে। পত্তন হল অটোমান সাম্রাজ্যের। ওতমানের আমলেই সে-রাজত্ব কৃষ্ণসাগর অবধি বিস্তৃত। বসফরাসও তুর্কীদেরই অধিকারে।

ওতমানের মৃত্যু ১৩২৬ সনে। তার দুই পুত্র। শাসনাধিকার তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। জ্যেষ্ঠ—স্থলতান,

কনিষ্ঠ—উজীর। এ নিয়ম অবশ্য বেশি দিন চলেনি। কিন্তু ওতমানের বংশ বেঁচে ছিল অনেক দিন। অটোমান সাম্রাজ্যের কাহিনীর উপসংহার খ্রীষ্টীয় ১৯২২ সনে। ওতমানের পরে ৫৯৬ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে অটোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেছেন ৩৬ জন সুলতান। তাঁরা সবাই নাকি ওতমানের প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ।

তুরস্কের ইতিহাসের প্রথমাংশটি অতিশয় গৌরবের। বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের খ্যাতি তখন অপরাহ্নে। তার দেহ এবং মনে জরার লক্ষণ। চতুর্দ্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তুর্কীরা তার সুযোগ নিল। বসফরাস পার হয়ে এমনকি তারা পা বাড়াল ইউরোপে। অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলে, হাঙ্গেরীর সীমান্তেও তুর্কী ফৌজ। একের পর এক বিজয়-কাহিনী। হঠাৎ তাতে ক্ষণিক বিরতি। হেতু তৈমুরলঙ্গের উত্থান। ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছেন দুঃসাহসী তৈমুর। তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনীর সামনে তাসের ঘরের মত খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে মধ্য এশিয়ার রাজত্বের পর রাজত্ব। তুরস্কও শেষ পর্যন্ত শিকার হল তাঁর। ১৪০২ সনে তৈমুর আনাটোলিয়ায় পা দিলেন। অটোমান সুলতান বায়াজিদ (Bayazid) তাঁর হাতে বন্দী হলেন। দেখে মনে হল, অঙ্কুরেই বুঝি বিনষ্ট হয়ে গেল তুর্কীদের সাম্রাজ্য-সাধ। কিন্তু আসলে এই নিগ্রহের কাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দুই বছর পরে অকালে মারা গেলেন তৈমুর। আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তুরস্ক। তুর্কী সুলতানরা আবার উদ্যোগী অভিযাত্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই অভিযানের শুরু বলা চলে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, সুলতান সেলিমের নেতৃত্বে। সুলতান সুলেমানের আমলে অটোমান সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষে। অ্যাড্রিয়াটিক কূলে আলবেনিয়া থেকে পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত এশিয়া-ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তখন তুর্কীদের দখলে। সাম্রাজ্যের সীমা অন্য

দিকে মিশর থেকে ককেশাস। ক্রিমিয়া এবং হাঙ্গেরী তুরস্কের অনুগত। উত্তর আফ্রিকায় তুর্কী সুলতানের অধিকার স্বীকৃত। ইউরোপ থেকে পূবের পথে তুর্কী বাহিনী, ভূমধ্য সাগরের সর্বত্র তুর্কী রণতরী। ইউরোপের রাজারা সুলতানের নামে উপঢৌকন পাঠান, ভিয়েনার দুয়ারে অভিযাত্রী অটোমান বাহিনীর করাঘাত শোনা যায়। এসব ষোড়শ শতকের শেষ দিককার কথা।

তারপর থেকে ধাপে ধাপে পতন। সুলেমানের পরবর্তী সুলতান সেলিম। তিনি অপদার্থ। বলা হয়, এই অধঃপতনের কারণ আদি বংশানুক্রমে ছেদ। সেলিম নাকি একজন আর-মেনিয়ান পরিচারিকার সন্তান। তাঁর পরে এলেন আরও ২৭ জন সুলতান। তাঁরাও ক্রমেই যেন আরও অনুজ্জ্বল, আরও অপদার্থ। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই অবনতির পিছনে অন্যতম কারণ হারেমের আকৃতি। দ্বিতীয় হেতু—হারেমের ভেতরে "কাফেস্" নামে ওই কারাগারটি। এক সময় নিয়ম ছিল উত্তরাধিকার প্রশ্ন নিয়ে রাজ্যে যাতে কোন বিভ্রাট দেখা না দেয় সেজন্য একজন ছাড়া সুলতানের আর সব সন্তানকে হত্যা করা হবে। পরবর্তীকালে স্থির হল, তার চেয়ে ভাল সবাইকে বাঁচিয়ে রাখা। প্রাসাদে নির্মিত হল কারাগার। সেখান থেকে কখনও কখনও বন্দীকে মুক্ত করে এনে বসানো হত সিংহাসনে। অভিজ্ঞতাশূন্য, অন্ধপ্রায় সেই অক্ষম শাসক সুলতান হিসাবে ব্যর্থ হবেন তাতে আর বিস্ময় কী! প্রমাণ—ইব্রাহিমের কাহিনী।

ইত্যাদি নানা কারণে সুলেমানের তিনশ' বছরের মধ্যে তুর্কী সাম্রাজ্য রুগ্ন, ক্লান্ত, অবসন্ন, বিকারগ্রস্ত। ইউরোপ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, স্বদেশে আবির্ভূত হলেন নবযুগের নায়ক কামাল পাশা। অটোমান সাম্রাজ্য অতঃপর ইতিহাস।

তুরস্ক এবার সম্পূর্ণ অন্যধরনের এক নবীন রাষ্ট্র। সেখানে কেউ আর সুলতান নন।

তুরস্কের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের জন্য কয়েকটি গ্রন্থ: Sir Edward Creasy—History of the Ottoman Turks ; Stanley Lane-Poole—Turkey ; Bernerd Lewis—The Emergence of Modern Turkey ; Francis McCullah—The Fall of Abdul Hamid ; H. C. Armstrong—Grey wolf.

কোন হারেমের মতই তুর্কী হারেম সম্পর্কেও বিশেষ কোন বই নেই। ইউরোপে হারেম সম্পর্কে যে-কাহিনী পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে, সেগুলোর আদি প্রধানত ভ্রমণকারীদের কিছু কিছু বিবরণ। বলা বাহুল্য, তাঁদের পক্ষেও হারেম বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ সহজ বা সম্ভব ছিল না, তাঁরা হাটে-বাজারে, দরবারের আনাচে-কানাচে যা শুনেছেন তা-ই সাগ্রহে কুড়িয়ে ফিরেছেন। এ ধরনের অনেক কাহিনী অবশ্য লভ্য। প্রথম দিককার (ষোড়শ শতকের) দর্শকদের বিবরণগুলোর সার পাওয়া যাবে A. H. Lybyer লিখিত Government of the Ottoman Empire in the time of Suleiman the Magnificent নামক গ্রন্থে। পরবর্তী হারেম-কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য: Nasim Sousa—The Capitulatory Regime of Turkey ; Dr. Miller—Beyond the Sublime Porte ; Edmund Chishull—Travel in Turkey and back to England ; H. G. Dwight—Constantinople Old and New ; Sir H. Luke—The Making of Modern Turkey ; Lady Mary Montagu—Letters···etc. ; Withers—Grand Sig-

nors Seraglio ; Mrs. Harvey—Turkish Harems and Circassian Homes ; N. M. Penzer—The Harem ; Lord George Herbert—A Night in a Moorish Harem.

যদিও এই বইয়ে প্রধানত তুর্কী এবং মুঘল হারেমের কিছু কিছু কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তাহলেও বলা অনাবশ্যক যে, হারেম শুধু এই দুই শাসকগোষ্ঠীরই বৈশিষ্ট্য নয়। পুরানো পৃথিবীতে বহু-বিবাহ একটি বহু প্রচলিত আচার। রাজা সোলোমনেরও তিনশ' স্ত্রী ছিল, উপপত্নী ছিল সাতশ'। বহু-বিবাহ নামক আচারটির উৎপত্তি বিকাশ এবং বিলুপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পাঠ্য : Edward Westermark—History of Human Marriage এবং ওঁরই লেখা আর একখানা গ্রন্থ—The Origin and Development of Moral ideas. কয়েকখণ্ডে সম্পূর্ণ প্রথম বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও আছে। নাম—A Short History of Marriage.

তবে একথা অনস্বীকার্য, আধুনিক পৃথিবীতে একটি নিয়মিত 'সংগঠন' হিসাবে হারেমের আবির্ভাব এবং বিকাশে পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ার মুসলিম নায়ক এবং শাসকদের অবদান অনেক। পরিবারের পরিধি চার স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ সত্ত্বেও কীভাবে সেখানে শত শত উপপত্নী-বোঝাই বিশাল হারেম গড়ে উঠেছিল তা জানতে হলে আরব জাতির উত্থান কাহিনীও প্রণিধানযোগ্য। নাটিং-এর অভিমত ক্রমাগত যুদ্ধজয়ের ফলে রাশি রাশি নারী বিজয়ী বাহিনীর হাতে এসে পড়েন, দ্রুত অন্তঃপুরে ভিড় বেড়ে ওঠে। এটাই শুধু একমাত্র কারণ তা বলা চলে না। বিজয়ী এবং বিজিতের সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থিক অবস্থাও এই সঙ্গে বিবেচ্য। সে-কাহিনী জানতে হলে অবশ্য-

পাঠ্য কয়েকটি বই: Edward Atiyah—the Arabs; George Antorius—the Arab Awakening; Sir John Glubb—The Empire of the Arabs, The Great Arab Conquests; Philip K. Hitti—History of the Arabs; H. A. R. Gibb & H. Bowen—Islamic Society and the West; Anthony Nutting—The Arabs.

হারেমের পরিবেশ পরিস্থিতি বোঝার পক্ষে সহায়ক আরও দুইটি গ্রন্থ—The Encyclopaedia of Islam (1927) এবং Encyclopaedia of Religion and Ethics (1934). 'হারেম' বা মুসলিম 'বিবাহ', 'স্ত্রীর অধিকার' ইত্যাদি ছাড়াও কতকগুলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ এই গ্রন্থ দুটিতে লভ্য। তবে সাধারণ পাঠকের কাছে হারেমের পরিমণ্ডল বোঝার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক বই, আমার মনে হয়, আরব্য উপন্যাস। ১৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ Sir Richard Burton-এর "The Book of the Thousand Nights and a Night" শুধু বিশ্বের অন্যতম উপাদেয় কাহিনী-সংকলন নয়, একটি মূল্যবান তথ্যের খনিও। এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে দরবারী এবং লৌকিক আচারের কথা। শুধু মান্য খলিফা আর তার অন্তঃপুরের গল্প নয়, সেদিনের আরব দুনিয়ার জীবন-দর্শন, আচার, অনুষ্ঠান, হাসি-কান্না সবই এখানে বর্ণিত। শাহরিয়র রাত্রিশেষে সঙ্গিনীকে হত্যা করতেন এ সংবাদ আমরা বলেছি, কেন তিনি ঘাতকে পরিণত হয়েছিলেন সে কাহিনী আমরা বলিনি। কারণ—তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিশ্বাসঘাতিনী। 'নারীকে বিশ্বাস নেই' এই ধারণাকে প্রমাণ করার জন্য যেমন অনেক গল্প, সেখানে তেমনই আছে এক 'কেন'র উত্তরে অন্য 'কেন'র গল্পও। যথা, 'ঝাড়ুদার এবং

সম্ভ্রান্ত মহিলা'র কাহিনীটি। বিস্মিত ঝাড়ুদারকে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত রমণী—স্বামীকে একদিন হেঁসেলের একটি দাসীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখেছিলাম আমি। সেদিনই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম সবচেয়ে নোংরা মানুষটির সঙ্গে আমি বাস করব সাতদিন! ওরা শুধু ক্রূর আর নিষ্ঠুর নয়, কখনও কখনও উদার, গর্বিত এবং উন্নত। আরব্য কাহিনীতে এমন দৃষ্টান্ত আছে, সুলতান তাঁর পত্নীর রূপ প্রিয় উজীরকে দেখাতে চান। বেগম যখন স্নান করছেন অলক্ষ্যে উজীরকে তিনি তখন দাঁড় করিয়ে দিলেন সেখানে। হঠাৎ রমণীর চোখে পড়লেন পর-পুরুষ দর্শক। এগিয়ে এলেন সুলতানও। তিনি হেসে বললেন—আমার ঘরে কী ঐশ্বর্য তা-ই দেখাচ্ছিলাম বন্ধুকে। রমণীর উত্তর—তা হয় না সুলতান। এর পরও আমি একজনেরই থাকতে চাই, হয় আপনার, না হয় ওই দর্শকের। উজীরের তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে উঠল। সুলতান নিহত হলেন।…মন্ত্রী জাফরের সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিয়ে খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কী বিভ্রাট ডেকে এনেছিলেন তাও স্মরণীয়। খলিফা বলেছিলেন, তোমাদের বিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু তোমরা কখনও একসঙ্গে মিলিত হতে পারবে না। মেয়েটি তাতে রাজী হতে পারেনি। রাত্রির অন্ধকারে সে এসে মিলিত হয়েছিল বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে। কোলে সন্তান এল। ক্রমে সব জানাজানি হয়ে গেল। হারুণ ক্রুদ্ধ। তিনি অতঃপর ইতিহাসের অন্যতম নিষ্ঠুর ঘাতক। বোনকে হত্যা করে তাঁর কক্ষেই কবর দিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে কবরস্থ হয়েছিল ঘাতকেরাও। তারপর নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন তিনি প্রিয় মন্ত্রী জাফরকে। সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী সেই মেয়েটি বিয়েকে খেলা হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি—তাই নয় কি? বার্টন লিখেছেন: অনেক পাঠকই বলেন, আরব্য উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলো যত আকর্ষণীয়, পুরুষ

চরিত্রগুলো ঠিক তা নয়। কী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে, কী কাজে তাদের মধ্যে 'পুরুষের চেয়েও পুরুষালি', ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রভাব তাদের অতুলনীয়। বার্টনের অভিমত—শুধু ক্রুর, লোভাতুর কিংবা ছলনাময়ী নারী নয়, হারেমে পিতৃগতপ্রাণ কন্যা, স্নেহশীলা জননী, ধর্মপ্রাণ ভক্ত, নির্মল চরিত্রের বিধবা এবং ত্যাগী :'মণীও অনেক ছিলেন। আরব্য উপন্যাসে পাঠক এদের প্রত্যেকের দেখা পাবেন। ওই বিশাল গ্রন্থটি পাঠ করার সুযোগ এবং সময় যাঁদের নেই, তাঁরা Bennett A. Cerf সম্পাদিত "The Arabian Nights" পড়তে পারেন। এতে 'মূল' গল্প সব কয়টিই আছে, এবং আদি সংস্করণের সৌরভ সহ। আরব্য নর-নারীর জীবন এবং আচার সম্পর্কে বার্টন দশম খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধর্ম, পোশাক, সমাজ, যৌনতা—কিছুই সেখানে বাদ নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে অতএব হারেমের নানা উপচার এবং অনুষ্ঠান (যথা, খোজা, বিকৃত যৌন আচার ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য ওই খণ্ডটি অপরিহার্য। কিছুকাল আগে এর একটি সংক্ষিপ্ত সারও প্রকাশিত হয়েছে। নাম—Love, War and Fancy, Ed. Kenneth Walker.

সাধারণ ভাবে মধ্যপ্রাচ্য এবং বিশেষ ভাবে হারেমের যৌন-জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা যায় নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোর ওপর চোখ বুলালে। Dr. Iwan Bloch—Anthropological Studies in the strange Sexual Practices of all Races in all Ages, Ancient and Modern (1933); Cheikh Nefzaouri—Perfumed Gardens; Allen Edwards—The Jewel in the Lotus. এর মধ্যে 'পারফিউমড গারডেনস্' অত্যন্ত

কৌতূহলোদ্দীপক। বিশেষতঃ এটি তথাকথিত যৌনবিজ্ঞানের বই হলেও গল্পচ্ছলে লেখা। এতে নারী-চরিত্রের নিন্দনীয় দিক্‌গুলো যত্নসহকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নারী কীভাবে পুরুষকে প্রতারণা করে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে অনেক। কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের প্রতি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের আকর্ষণের কথাও সবিস্তারে বর্ণিত। এই গ্রন্থে আতর ইত্যাদি গন্ধদ্রব্যের ক্রিয়া সম্পর্কেও নানা গল্প রয়েছে। অ্যালেন এডোয়ার্ড—প্রাচ্যের যৌন-জীবনের সব দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। কিন্তু রিচার্ড বার্টনের রচনা পড়বার পর তাঁকে মনে হবে নেহাত পল্লবগ্রাহী। তিনি কোন আচারেরই কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে পারেননি। সে তুলনায় রিচার্ড বার্টনের লেখা খোজা কিংবা সমকামিতা সম্পর্কিত অধ্যায় দুটি অতিশয় মূল্যবান। মেয়েদের ওপর অস্ত্রোপচার যে শুধু কোন কোন মুসলিম সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল না, তাও তিনি প্রমাণ করেছেন। খোজাদের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠ্য H. R. M. Chamberlin-এর "The Eunach in Society." ভারতীয় খোজাদের সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ আছে N. M. Penzer-এর "Ocean of Story" (Vol.-III) গ্রন্থটিতে। মেহেদি, কাজল ইত্যাদির ব্যবহার, এক কথায় প্রাচীন এবং মধ্যযুগের প্রাচ্যে মেয়েদের প্রসাধনী সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—Ocean of Story, Vol.-I. হামাম তথা তুর্কী স্নানাগার সম্পর্কে জানতে হলে পাঠ্য—Erasmus Wilson—The Easter Turkish Bath; E. de Amicis—Constantinople.

মুঘল হারেম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অধিকাংশই গৃহীত হয়েছে পশ্চিমী পর্যটকদের বিবরণ থেকে। তাঁদের রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য: Niccolao

Manucci—Storia Do Mogor (৪ খণ্ড) ; Francois Bernier—Travels in Hindusthan ; Sir W. Foster—Early Travels in India ; J. B. Tavernier—Travels···etc. এ ছাড়া মুঘল ভারতকে জানবার পক্ষে অত্যাবশ্যক আরও কয়েকটি গ্রন্থ : History of India as told by its own Historians (Ed. H. M. Elliot and J. Dawson) ; James Todd—Annals and Antiquities of Rajasthan ; Stanley Lane-Poole—Mediaeval India under Mohammadan Rule ; Yusuf Husain—Glimpses of Mediaeval Indian culture ; Ishwari Prosad—Mediaeval India ; Tarachand—Influence of Islam on Indian culture ; Khuda Bux—Studies Indian and Islamic ; Sir Jadunath Sarkar—Mughal Administration ; S. M. Edwards—Mughal Rule in India. তদুপরি আছে মুঘল সম্রাট এবং অন্তঃপুরিকাদের রচনাবলী। সেগুলোরও ইংরাজী অনুবাদ লভ্য।

মুঘল সম্রাটদের বেগম-বিবির সংখ্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হয়েছে। আকবরের হারেমে পাঁচ হাজার রমণী সম্পর্কে আবুল ফজলের মন্তব্য—"the large number of women—a vexatious question even for great statesmen—furnished his Majesty with an opportunity to display his wisdom (!)" তবে তাঁদের মধ্যে একজন রমণী যে সম্রাটকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন সে বিষয়ে অনেকে নিঃসন্দেহ। তিনি বিহারীমলের কন্যা আকবরের প্রিয় 'মারিয়াম-অজ-জামানি'। আইনত তিনি আকবরের তৃতীয় পত্নী। কিন্তু তিনিই যেন প্রথমা। তাঁর প্রেরণায়

সম্রাট অন্য ধরনের মানুষ। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা করেছেন H. Goetz. (দ্রষ্টব্য—Essays presented to Sir Jadunath Sarkar, Punjab University, Vol-II). আকবর-পত্নীর সঙ্গে তিনি জাহাঙ্গীরের হিন্দু পত্নী উদয়পুরের 'মোটা রাজা'র কন্যা 'জগৎ গোঁসাইনী' ওরফে যোধাবাঈয়ের তুলনা করে দেখিয়েছেন, প্রথমার তুলনায় দ্বিতীয় কত সাধারণ।

ভারতে মুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তুর্কী হারেমের সব লক্ষণ এখানে বর্তমান। মধ্য প্রাচ্যের হারেমে জাতিভেদ নেই। নেই ভারতেও। ফিরোজ তুঘলক দিপালপুরের কন্যা নীলাদেবীর সন্তান। আউরঙ্গজেবের প্রিয়পুত্র কামবক্স খ্রীষ্টান জননীর সন্তান, খসরু মানবাঈয়ের পুত্র। ভারতে একমাত্র মুসলিম মহিলা দিল্লীর সিংহাসনেও বসেছেন—তিনি সুলতানা রাজিয়া। কিন্তু এখানেও রোজলানা বা কুস্থমের মত নারীর অভাব নেই। প্রসঙ্গতঃ আকবরের ধাই-মা মোহন আনাগার কথা স্মরণীয়। আপন পুত্র আধম খাঁর জন্য তাঁর ষড়যন্ত্র উল্লেখ্য। বজবাহাদুরের কাছ থেকে রূপমতীকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর রূপমতী আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু বজবাহাদুরের হারেমের অন্য মেয়েরাও বাঁচতে পারেনি। ইতিহাস বলে, জননী মোহন আনাগার পরামর্শেই আধম খাঁ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল তাদের। স্মরণীয় ইলতুতমিসের প্রিয় মালিকা তথা শাহ তুরকানের নিষ্ঠুরতার কাহিনীও। রাজিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তিকে ঠেকাবার জন্য যে কোন হীন পন্থা অনুসরণে এই রমণী রাজী।···শুধু নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত নয়। প্রেম-প্রণয়, নৈতিকতা, ধর্মবোধ, বিদ্যাচর্চায়ও অন্যান্য স্মরণীয় নাম খুঁজে পাওয়া যাবে এদেশের মুসলিম শাসকদের অন্তঃপুরে। রাজিয়ার ভালবাসা—সেও তো এক অনবদ্য কাহিনী। প্রথম

প্রেমিক আলতুনিয়া মান্য ও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু জামাল উদ্দীন ইয়াকুত তা নয়। সে আবিসিনিয়া থেকে আগত একজন সামান্য ক্রীতদাস, সুলতানার ঘোড়ার তদারকি তার কাজ। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের অভিযোগ—ইয়াকুত নিজে হাতে ধরে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিত সুলতানাকে। এবং তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলেই সুলতানার ভাগ্যবিপর্যয়। এই প্রসঙ্গে যে ফারসী ছড়াটি তৎকালে প্রচলিত ছিল তার ইংরাজী মর্ম— "Good fortune turned its back on her/No sooner it saw black dust on her skirt." রাজিয়ার বিস্তৃত কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য—Rafiq Zakaria—Razia : Queen of India.

লক্ষ্ণৌর নবাবদের অন্তঃপুরের যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সেগুলো প্রধানত সংগৃহীত নিম্নোক্ত বইগুলো থেকে।

Ghulam Husain Khan—Seir-ul-Mutaqherin (4 vols) ; H. C. Irwin—The Garden of India ; William Knighton—The Private Life of an Eastern King ; Fanny Parkes—Wanderings of a Pilgrim···etc. (2 vols) ; Michael Edwards—The Orchid House ; Mrs. Meer Hassan Ali—Observations on the Mussulmans of India. মুর্শিদাবাদের কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য—Sayyid Ghulam Husain Tabatabai—Seir Mutaqherin (4 vols) ; Ghulam Husain Salim—Riyazu-s-Salatin ; C. Stewart—History of Bengal ; Brojendra Nath Banerjee—Begams of Bengal ; Dr. K. K. Dutta—Alivardi Khan.

বলা নিষ্প্রয়োজন, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ, রণজিৎ সিং কিংবা টিপু সুলতানের অন্তঃপুর নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ থাকলেও আমি সে-চেষ্টা করিনি। এইসব শাসক সম্পর্কে অনেক বই রয়েছে। আমাদের আলোচ্য শুধু হারেম। দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্যই কখনও কখনও এসব অন্তঃপুরে উঁকি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ হিন্দু অন্তঃপুর সম্পর্কিত অধ্যায়টি সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা দরকার। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—P. Thomas—Indian Women through the Ages, Kama-Kalpa ; Abbe Dubois—Hindu Manners, Customs, etc. ; A. Hekar—Position of Women, etc. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তার বঙ্গানুবাদও লভ্য (২ খণ্ড)। অনুবাদক—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক। অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত অন্তঃপুরে গর্ভসংস্থা, ব্যাধিসংস্থা, বৈদ্য-প্রত্যাখ্যাত সংস্থা, কন্যাপুর, কুমারপুর ইত্যাদি নানা স্বতন্ত্র মহলের উল্লেখ আছে। রানীর কক্ষে গমনের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কৌটিল্য শুধু 'বিশ্বস্ত বৃদ্ধা পরিচারিকা'কে সঙ্গে নিতে পরামর্শ দেননি, তিনি আরও কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন।—"রাজা কখনও যেন মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু, জটাধারী শৈব-পাশুপতাদি ও কুহক বা মায়া প্রয়োগকারীদের মহিষীদের সঙ্গে পরিচয় বা সংসর্গ রাখিতে না দেন। বাহিরের দাসদাসীর সঙ্গেও অন্তঃপুরিকাদের সংসর্গ নিষিদ্ধ।" "অশীতিবর্ষবয়স্ক পুরুষেরা ও পঞ্চাশদ্বর্ষবয়স্কা স্ত্রীরা যথাক্রমে পিতা এবং মাতার বেশধারী ও বেশধারিণী থাকিয়া এবং রাজবাড়িতে কার্যকরী স্থবির ও নপুংসকেরা অন্তঃপুরস্থ রাজস্ত্রীগণের চরিত্রের শুদ্ধতা ও দুর্বলতার কথা জানিয়া রাখিবে এবং রাজাকে জানাইবে।"

শুধু তাই নয়—"সব দ্রব্যই বাহির হইতে আগমন ও ভিতর হইতে নির্গমনের বিষয় নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ হইলে এবং সেগুলি সম্যক পরীক্ষিত হইলে বাহিরে যাইতে পারিবে অথবা ভিতরে আসিতে পারিবে।" ইত্যাদি।

স্থুতরাং, বলা অনাবশ্যক, কি রাজকীয়, কি সুলতানী—ক্ষমতাবানদের সব অন্তঃপুর-কাহিনীই মোটামুটি এক, চরিত্রে অভিন্ন।

॥ চিত্র পরিচয় ॥

১। বসফরাসের কূলে তুর্কী সুলতানের প্রাসাদ। এ চিত্রটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিলট (Grelot) নামে একজন ভ্রমণকারী। প্রথম প্রকাশ কাল—১৬৮০। ২। প্রাসাদের একাংশ। এটা প্রথম অঙ্গনের দৃশ্য। চিত্রকর—এ. আই. মেলিং, প্রথম প্রকাশ কাল—১৮১৯। ৩। তুর্কী হারেমের অভ্যন্তর। মেলিংকৃত চিত্র। এই চিত্রটির বিবরণ বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ৪। হামাম দৃশ্য। এ ছবিটির প্রথম প্রকাশ কাল—১৭৮৭। এটি প্রথম ব্যবহার করেন এন. এম. পেনজার। ৫। হারেমের উপবনে নৃত্যসভা। কাল্পনিক চিত্র। চিত্রকর জনৈক ইংরেজ শিল্পী।

এই লেখকের অন্য গ্রন্থ

ঠগী আজ একটি সুপরিচিত শব্দ। চার্চিল নাৎসীদের বলতেন—ঠগ্‌স, মার্কিনী কাগজে শিকাগোর দস্যুরাও 'ঠগ'। কিন্তু ফিরিঙ্গীয়া, এনায়েত, দুর্গা, রোসম জমাদার, রুস্তম খাঁ—যাদের সামনে রেখে এই শব্দটির জন্ম, তারা ভারতের সেই বিস্ময়কর মানুষগুলো, ইতিহাসে নাম যাদের ঠগী। তিন শ' বছরে দশ লক্ষ মানুষ উধাও হয়েছিল তাদের রোমাঞ্চকর এবং উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। তৃতীয় মুদ্রণ। ঝিরনিতে। অথচ সিক্কা ওদের—হলুদ রঙের একটি রুমাল, নিশান—ছোট্ট একটি কোদাল। কে ওরা, কোথা থেকে এল, কেনই বা এল, কি তাদের কৌশল, কি ধর্ম, কিভাবে একটি মানুষের একক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ওদের নিশ্চিহ্ন হতে হল, তারই তথ্যনির্ভর, বিচিত্র এবং বিস্ময়কর কাহিনী। দুষ্প্রাপ্য চিত্রশোভিত এই গ্রন্থটি ক্রাইম-কাহিনীর মতই

ঠগী ॥ ৫·০০